

“মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা শুরু হওয়ার আগে নিজ জমিতে কৃষিকাজ করতাম। কাজ শেষে ছেলেমেয়েকে পড়াতাম। সব মিলিয়ে আমার ব্যস্ত সময় কাটত। নৃশংসতা শুরু গত ২৫ আগস্ট সকালে। প্রতিদিনের মতো পরিবারের সবাই আমরা একসঙ্গে খাচ্ছিলাম। ওই সময় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। অতর্কিত গুলি ছুড়তে শুরু করে। তাদের নির্বিচার গুলিতে আমাদের পরিবারের পাঁচ সদস্য প্রাণ হারায়।’

তিনি বলেন, ‘আমি দেখলাম, পিঠে গুলি লেগে মা মাটিতে পড়ে আছেন। মুখ ও শরীরে অনেক ছুরিকাঘাত খাওয়া আমার বোন পড়ে ছিল মায়ের পাশেই। এ ভয়ংকর দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। তাঁদের এ অবস্থা দেখে যে একটু কাঁদব, সেই সামান্য সুযোগটুকুও পাইনি। কারণ সামরিক বাহিনীর গুলি থেকে বাঁচতে পালাতে হয়েছে।’

নিজের বোনের সেই ধর্ষণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বাংলাদেশে শরণার্থী আহসান বলেন, একজন সেনাসদস্য বোনকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। এ সময় তাঁকে পিটিয়েছে সেনারা। তিনি বলেন, ‘এরপর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোনটি কথা বলে না, কোনোরকমে একটু-আধটু চলতে পারে। বাঁশ ও কম্বলের সাহায্যে আমি ও আমার ভাই বোনকে বাংলাদেশে বহন করে এনেছি।’ বাংলাদেশে আসার কথা বর্ণনা করে আহসান বলেন, ‘বাংলাদেশে আসার পথে আমরা আরও ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছি। পথে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। দিনের পর দিন খেতে না পাওয়া অনাহারী শিশু ও বৃদ্ধের কান্না দেখেছি’।

প্রকাশনায়

সৃজনশীল প্রকাশনী.....

মাকতাবাতুত তাসনীম

সিটি বাণিজ্যিক ভবন, বন্দরবাজার, সিলেট।

মোবাইল : ০১৭৩২ ৪৯৮৮৮৮, ০১৭২৮৭২২২২১



পরিবেশনায়

নিউ বশিদিয়া লাইব্রেরি

[অভিজাত ইসলামিক বই প্রকাশক ও পরিবেশক]

হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা), বন্দরবাজার, সিলেট।

মোবাইল : ০১৭৩২ ৪৯৮৮৮৮, ০১৭২৮৭২২২২১



আরাকানের কান্না

রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, চলমান সংকট ও সমাধানের পথ

সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ



আরাকানের কান্না

রোহিঙ্গাদের ইতিহাস, চলমান সংকট ও সমাধানের পথ

সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ



সৃজনশীল প্রকাশনী.....

মারকাতাকুতুত আসতীম

আরো কালের কোন্

লেখক সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব লেখক

প্রচ্ছদ মুহাম্মদ রশীদ মুশতাক

প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ২০১৭

প্রকাশক সুফিয়ান আহমদ

মাকতাবাতুত তাসনীম
৩৬/২ সিটি বাণিজ্যিক ভবন, বন্দর বাজার,
সিলেট। ০১৭২৮৭২২২২১

পরিবেশক নিউ রশীদিয়া লাইব্রেরি
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট (৩য় তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট। ০১৭৩২৪৯৮৮৮৮
মাকতাবাতুস শামস
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মার্কেট (আন্ডারগ্রাউন্ড)
বন্দর বাজার, সিলেট। ০১৭৬৫৭৩৫৬৩৮
মাকতাবাতুল আযহার, সিলেট শাখা
হাজী কুদরত উল্লাহ মার্কেট (২য় তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট। ০১৭৫৩ ৭৬২৮৮০

ঢাকা পরিবেশক সাউদিয়া কুতুবখানা
৫৬/২ চক সার্কোলের রোড, চকবাজার, ঢাকা,
০১৭৪১ ১৪৪৭৮৫।

মূল্য ১০০/- (একশত টাকা মাত্র)

মুদ্রণ বোখারা মিডিয়া
০১৭১২ ৯০৫১২৮

অনলাইন শপ গ্রন্থক

www.rokomari.com/kalantorprokasoni
www.boipark.com/kalantorprokashoni

উৎসর্গ

বিশ্বের সকল মজলুম
মুক্তিকামী মানুষকে

প্রকাশকের কথা

আমি মাথা হেলিয়ে উপরের আকাশের দিকে তাকালাম। নিঃসীম শূন্যতায় জীবন যেন দুঃখ হয়ে বেদনা হয়ে দিকভ্রষ্ট চিলের মত ঘুরপাক খায়। আকাশের নাভিতে দৃষ্টি ফেলে তাকিয়ে থাকলাম অনেক্ষণ। কী গভীর সৌন্দর্য শূন্যতায় জড়িয়ে আছে নীল হয়ে। শূন্যতার সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘমালা। আমার ভেতরে হাহাকার জাগে। আর সে সময় আমি আরো গভীর করে টের পাই বুকের ভেতর এক কষ্টের যাতনা। আমি শব্দ-অক্ষর, বাক্যে অচল এক অসহায় দ্রষ্টা মাত্র। সুতরাং উম্মাহর কোন কষ্ট দেখে হৃদয় কেঁদে ওঠে ঠিক! কিন্তু করার থাকে না কিছুই। আমি ১৯৭১ দেখিনি কেবল মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোর গল্প শুনেছি। লাখ লাখ বাঙ্গালী শরণার্থীদের কষ্টের কাহিনী পড়েছি ইতিহাসের পাতায়। ফলে আমাদের সময়ে এসে আজকের রোহিঙ্গা শরণার্থী কষ্টগাঁথা জীবনের নির্মম যাতনা ও জীবন যুদ্ধ কেবল উপলব্ধি করে করে শিউড়ে উঠি। কিন্তু তা যথাযথ ব্যক্ত করার মত ভাষা আমার নেই। আমি দুঃখিত। তাই সাধ্যের সীমিত প্রয়াস নিয়ে মজলুম রোহিঙ্গাদের জন্য ভালো কিছু করার প্রবল ইচ্ছা আমায় তাড়িত করে। সেই বোধ থেকে সু-লেখক, কবি, ঔপন্যাসিক, বহুগ্রন্থ প্রণেতা সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ'র লেখা “আরাকানের কান্না” গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে একজন মানুষ হিসেবে কিছুটা

দায় সাড়াতে চাই। গ্রন্থটির যাবতীয় লভ্যাংশ আমার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে। আশাকরি গ্রন্থটির পরতে পরতে ঐতিহাসিক আরকানের হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপাদান এবং গভীর আবেগময় ঘটনাপ্রবাহ সাথে সাথে চলমান রোহিঙ্গা সংকট ও তার সমস্যা সমাধানের যে চিত্রপট লেখক তুলে ধরেছেন তা ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

এ গ্রন্থটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন, সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে জিয়া মঞ্জুর, আখলাক আহমদ, রশীদ মুশতাক, কাজী সফওয়ান আহমদ, সাবের চৌধুরীর ঋণ শোধ করার মত নয়।

সুফিয়ান আহমেদ

স্বত্বাধিকারী

মাকতাবাতুত তাসনীম

লেখকের কথা

আরাকান। যেখানে যুগ যুগ ধরে ভুলুষ্ঠিত হচ্ছে মানবতা। সংখ্যালগু আদি জনগোষ্ঠীর উপর নির্মম নির্যাতনের স্টীম রোলার হার মানায় পৃথিবীর সকল বর্বরতাকে। রোহিঙ্গাদের উপর অমানুষিক নির্যাতনের করুণ দৃশ্য দেখে হাহাকার করে উঠেছে বিশ্বের বিবেকমান মানুষের হৃদয়। দুনিয়া জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠে বার বার, আবার থেমে যায়। তারপর আবার শুরু হয় বার্মা সেনাবাহিনী ও বর্বর মগদের মুসলিম নিধন। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশে ছুটে আসে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ বার বার পরম মমতায় তাদের আশ্রয় দেয় মানবিক কারণে। বার্মার মুসলমানদের গণহত্যা দেখে বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের অন্তর কেঁপে ওঠে। তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতিবাদের পাশাপাশি অসহায় মজলুম মানবতার পাশে দাঁড়ান যার যার অবস্থান থেকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যুগ যুগ ধরে এই রোহিঙ্গা সংকটের শেষ কোথায়? চলমান সংকট নিরসনের পথ কী হতে পারে? এখনই বন্ধ হওয়া প্রয়োজন এই নির্মম বর্বরতা। বাংলাদেশ আর কতকাল লাখ লাখ শরণার্থীর বোঝা বহন করে চলবে? এই সংকট নিরসনে বাংলাদেশ, মুসলিম বিশ্ব ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়সহ সকলের প্রচেষ্টায় একটি স্থায়ী সমাধানে আসা উচিত বলে মনে করেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ।

আরাকান বার্মার একটি ক্ষুদ্র এবং সমৃদ্ধ প্রদেশ। বার্মা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বে প্রায় ১৭২ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত দ্বারা বাংলাদেশ ও বার্মা সংযুক্ত। ১০০ মাইল দীর্ঘ নাফ নদী এবং ৭২ মাইল দীর্ঘ দুর্লংঘ্য পার্বত্য সীমান্ত উভয় দেশকে বিচ্ছিন্ন করেছে। নাফ নদীর এক পাশে টেকনাফ অপর পাড়ে বঙ্গপোসাগরের তীরে ১৪ হাজার ৯ শত ৯৪ বর্গ মাইল এলাকা পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ আরাকান রাজ্য। আরাকানের মুসলিম ঐতিহ্যের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। সর্বপ্রথম হজরত সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস রা. রাসুলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় (৬১৭-৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে) আরাকান অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে আসেন। ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর শাসনামলে

আরাকানের শাসকদের সঙ্গে আরবীয় মুসলমানদের সুগভীর সম্পর্কের বিষয়টিও প্রমাণিত। তবে ৭ম শতাব্দীতে আরব ও ইয়ামনি বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের প্রয়োজনে আরাকানের আকিয়াব বন্দরে আগমন করে। তাঁদের সাথে আসেন বহু আলেম, সুফী, দরবেশ ও মোবাল্লীগন। তাদের মাধ্যমে আরকান এক সমৃদ্ধ ভূখণ্ডে পরিণত হয়। উপমহাদেশীয় মুসলিম সভ্যতার এক ঘনঘোর ট্রাজেডি ক্ষেত্র রোহিঙ্গা আরাকান। রোহিঙ্গা মুসলমানরা আরকানের উড়ে এসে বসা কোন জাতি-গোষ্ঠী নন। তারা সেখানে শত শত বছর ধরে বসবাস করে আসছেন। এক সময় রোহিঙ্গাদের বর্তমান আবাসভূমি আরাকান ছিল স্বাধীন এক রাজ্য। ১৭৮৪ সালে বার্মার রাজা কেডপায়া এটি দখল করে বার্মার অধীনে একটি করদ রাজ্যে পরিণত করেন। আরাকান রাজদরবারে ছিলেন অনেক বাঙ্গালী মুসলমান। আরাকানের রাজদরবারই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা ভাষার জোয়ার এসেছিল। মহা কবি আলাওয়াল, কবি দৌলত কাজী, রাজ পুরুষ কোরেশী মাগন ঠাকুর, কবি আশরাফ খান, আরাকানের প্রধানমন্ত্রী তরফের (হবিগঞ্জ) সৈয়দ মূসা প্রমুখ যুগ মানবগণের জন্য আজও আরাকান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। মহাকবি আলাওয়াল রোসাং (রোহিঙ্গা) রাজ দরবারের সভাকবি ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন পদ্মাবতী। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের অমর কাব্য সতি ময়না, ছয়ফুল মুলুক, জংনামা, চন্দ্রাবতী, ইউসুফ-জুলেখা, মধুমালতী, নবী বংশ মহাকাব্যসহ মহাকবি আলাওয়াল ও মহাকবি সৈয়দ সুলতানের কবিতায় আরকানের বর্ণনা পাওয়া যায়। এছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল আরাকান রাজ দরবারের আনুকূল্যে। ঐতিহাসিকভাবে আরাকানের মানুষের সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষের একটি সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আরাকানের মুসলমানরা যারা রোহিঙ্গা হিসেবে পরিচিত তারা বাংলাদেশি। মিয়ানমারের ইতিহাস থেকে জানা যায় মিয়ানমারের পার্লামেন্টে অতীতে মুসলমান রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদের নাম-দামও বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। তারা যদি মিয়ানমারের নাগরিক না হয়ে থাকেন, তাহলে তারা মিয়ানমারের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব

করেছিলেন কীভাবে? আসলে মিয়ানমার সরকার একটি কৌশল অবলম্বন করেছে যাতে যেকোনভাবে তারা আরাকানকে মুসলমান শূন্য করতে পারে।

এই গরিয়ান ঐতিহ্যসহ হাজার বছরের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আরাকানীরা বিগত কয়েক যুগ ধরে মৌলিক অধিকার অর্জনের জন্য কী অপারিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বার্মার বৌদ্ধ জঙ্গী ও মগ সন্ত্রাসীদের হাতে আরাকানী মুসলমানরা নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হচ্ছেন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও বিতাড়িত হচ্ছেন নিজ বসত ভিটা থেকে। বোনেরা ধর্ষিতা ও লুণ্ঠিতা হচ্ছেন। শিশুরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সাগরে ভাসছে আরাকানের কচি-কাঁচাদের লাশ। রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাড়ি-ঘর, জমি-জামা পুড়িয়ে ছারখার করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত আরকানীরা গুলিবিদ্ধ হয়ে, বেয়নেট-চার্জ নিয়ে হাহাকার করতে করতে আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করছেন। মহিলা ও শিশুরা শরণার্থী হিসেবে আমাদের দেশে আশ্রয় এসেছেন, তাদের কারও ইজ্জত বেঁচে নেই, তাদের পর্দানশীন পবিত্রতার উপর গজব ঢালা হয়েছে। পৃথিবীর সকল বর্বরতাকে হার মানিয়েছে রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক জাহেলি নির্যাতন। কোনো সভ্য জাতি বা দেশ তা করতে পারে না।

এই পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের অতীতের ঔপনিবেশিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতা, ৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্যাতনের মুখে বিপন্ন হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়াকে স্মরণ করে তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে আমরা পালিয়ে ছিলাম ভারতে। দলে দলে বাঙ্গালীরা ভারত পালানোর সংখ্যা পৌঁছেছিলো প্রায় কোটিতে। সেসময় পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ছিলো আমাদের বিরুদ্ধে। আমেরিকা চিনের বিরোধীতার মুখে বাংলাদেশের শরণার্থীদের আশ্রয় ও সবধরণের সহযোগিতা করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। আজকের রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ ৭১ সালে ভারতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কাজ করতে পারে। সেই সময় ৩০

লক্ষ শহীদ ও ২ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত ভুলুঠিত হয়েছিল বাঙ্গালীদের। ৭১ সালের আমাদের উপর নেমে আসা নির্যাতনের অভিজ্ঞতায় অবশ্যই মানবিক দায়বোধ থেকে বিপন্ন আরাকানি শরণার্থী ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের স্বপক্ষে নৈতিক, মানবিক, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও আর্থিক সহায়তা নিয়ে দাড়ানো উচিত। আর বাংলাদেশ সরকার সাহসের সাথে সেই সংকট মোকাবেলায় কাজ করে যাচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। চলমান ইস্যুতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে নানা তথ্য সংযোজিত করা হয়েছে। তথ্যগত কোনো ভুলত্রুটি পাঠকদের চোখে পড়লে লেখক ও প্রকাশককে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম জাযা দান করুন।

সৈয়দ আনোয়ার আবদুল্লাহ
হবিগঞ্জ

সূচি

প্রাগ ঐতিহাসিক পর্ব • ১৩
রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ • ১৪
মিয়ানমারের আদি নাম ও ভৌগলিক অবস্থান • ১৬
মুসলিম নিপীড়নের সূত্রপাত • ১৭
ব্রিটিশ শাসনামলে আরাকান • ১৮
আরাকান মুসলমানদের বিপর্যয় • ১৯
রাজনৈতিক বৈষম্যের স্বীকার • ২১
রাষ্ট্রহীন এক জনগোষ্ঠী • ২৩
তেরঙা কার্ডে ঠাঁই হয়নি • ২৪
নিজ গ্রামের উন্মুক্ত কারাগারে • ২৪
বিয়েতে বাধা, সন্তান ধারণে নিয়ন্ত্রণ! • ২৫
চিকিৎসায় বাঁধা প্রদান • ২৬
শিক্ষায় সীমিত অধিকার • ২৭
বন্দী আরাকান • ২৭
শরণার্থী সমস্যা • ৩০
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী • ৩১
বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী • ৩৩
দায় আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর • ৩৪
বাংলাদেশের মানবিকতার প্রশংসা বিশ্বজুড়ে • ৩৫
রোহিঙ্গা মুসলমানদের যা যা করণীয় • ৩৬
বাংলাদেশের যা যা করণীয় হতে পারে • ৩৬
আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যা যা করণীয় হতে পারে • ৩৭
মিয়ানমারের যা যা করণীয় হতে পারে • ৩৮
রোহিঙ্গাদের দেখে আপ্ত সাংবাদিকরাও • ৩৮
রোহিঙ্গা গ্রামে গিয়ে যা দেখলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক • ৪০
শরণার্থীদের কান্না • ৪২
রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে • ৫৩
রোহিঙ্গাদের কষ্ট দেখে কাঁদলেন প্রধানমন্ত্রী • ৫৮
‘প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাবো, কিন্তু নদীতে ঠেলে দেবো না’ • ৬০
বিশ্ব গণমাধ্যমে এক মানবিক রাষ্ট্রনায়ক • ৬১
উপসংহার • ৬৪

প্রাগ ঐতিহাসিক পর্ব

ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় মূলত ১৩ হাজার বছর আগে এ ভূখণ্ডে প্রথম মানববসতি স্থাপিত হয়; যা এর পর থেকে আধুনিক মিয়ানমারের সময়কাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। মিয়ানমারের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী ছিল তিব্বতীয়-বার্মান ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এই জনগোষ্ঠী পাইয়ু নগর-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। নবম শতকে বার্মার জনগোষ্ঠী নামে এর একদল মানুষ ইরাবতী উপত্যাকা থেকে এসে এ অঞ্চলে বসবাস শুরু করে এবং বেগান রাজ্য (১০৪৪-১২৮৭)? স্থাপন করে। এ রাজ্য ছিল ইরাবতী এবং এর আশপাশের অঞ্চলকে একীভূত করে গঠিত একটি স্বাধীন রাজ্য। এই সময়ে বর্মি ভাষা এবং বার্মার সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। ১২৮৭ সালে প্রথম মঙ্গল আগ্রাসনের পর আভা রাজ্য, হান্তাওয়ারি রাজ্য, ও মারুক ইউ রাজ্য ছিল এ অঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ষোলো শতকে টাউঙ্গু রাজবংশ (১৫১০-১৭৫২) পুনরায় বার্মাকে একীভূত করে দক্ষিণ এশিয়ার এক বৃহৎ সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তবে এই সম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তী টাউঙ্গু সম্রাটরা কিছু অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা সতেরো এবং আঠারো শতকে বার্মাকে একটি সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আঠারো শতকের দ্বিতীয় অংশে, কনবাউং বংশ (১৭৫২-১৮৮৫) ক্ষমতা দখল করে এবং টাউঙ্গুদের রাষ্ট্র সংস্কার নীতি অনুসরণ করে। তারা আশপাশের অঞ্চলগুলোতো কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে এবং বার্মাকে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে স্বাক্ষর রাষ্ট্রে পরিণত করে। এই বংশের শাসনামলে বার্মা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ১৮২৪-৮৫ সালের অ্যাংলো-বর্মি যুদ্ধের সূচনা হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ বার্মায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। খৃষ্টপূর্ব যুগের ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায়, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে আর্যরা ভারতবর্ষে আগমন করে। তখন সারা ভারতবর্ষ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। বাংলা নামেও কোন আলাদা রাজ্য ছিল না। গৌড়, বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, বরেন্দ্র, রাঢ় প্রভৃতি রাজ্যে বর্তমান বাংলাদেশ বিভক্ত ছিল। আর্যরা এদেশে আগমনের কিছুকাল পর উত্তর ভারতে মৌর্য রাজ বংশের আবির্ভাব

ঘটে। এরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহকে একত্রিত করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। এ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম রাজা আশোক। সম্রাট আশোক এক সময় এক সু সুসজ্জিত হস্তি বাহিনী নিয়ে ভারতের মগধ আক্রমণ করেন। মগধ থেকে পালিয়ে কিছু লোক আরাকানে আশ্রয় নেয় এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এরাই ‘মগ’ নামে পরিচিত হয়।

ইতিহাস অন্বেষায় দেখা যায়, ইসলামের প্রথম যুগে আরব ও ইয়ামনী বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে আরাকানের আকিয়াব বন্দরে এসে উপনীত হন। তাঁদের সঙ্গে অনেক অনেক সুফী-সাধক ও ইসলাম প্রচারকবৃন্দও ছিলেন। সাগর বিধৌত ও পাহাড় পরিবেষ্টিত এ ভূ-খণ্ডের তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধিবাসীদের সহজ সরল জীবন যাপন পদ্ধতি ও আরাধনা উপাসনার যথোপযুক্ত ক্ষেত্র বিবেচনা করে সুফী-সাধকরা এ অঞ্চলে বসবাস করতে অনুরাগী হয়ে উঠেন। আর এমনভাবে শুরু হয় আরাকানে মুসলিম বসতি। আরাকানের মুসলিম অধিবাসীদের বলা হয় রোহিঙ্গা মুসলমান।

রোহিঙ্গা নামের উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশ

“তাওয়ারিখে ইসলাম আরাকান ও বার্মা” নামক গ্রন্থের এক বর্ণনায় দেখা যায়, ঈসাব্দীয় অষ্টম শতাব্দীর কোন এক সময়ে একটি আরব দেশীয় বাণিজ্য জাহাজের নিমজ্জমান নাবিকরা (আরাকান অঞ্চলের কাছে) ‘রহম রহম’ শব্দ করে নিজেদের উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। তাদের এ চিৎকার সমুদ্র তীরবর্তী আরাকানবাসীরা শুনতে পায়। পরবর্তীকালে এ সব উদ্ধার প্রাপ্ত নাবিকরা আরাকানে বসবাস শুরু করলে আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ আরাকানিরা তাদের ‘রহম’ নামে ডাকতে শুরু করে। এই রহম শব্দটি আরাকানীদের নিকট বিকৃত হয়ে রোহিঙ্গা বা রোহাঙ্গা নামে পরিচিত হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় জানা যায়, বঙ্গ বিজয়ী বীর বখতিয়ার খিলজী ১২০৩ সালে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য) অধিকার করার পর তাঁর রাজ্যসীমা আরো বিস্তৃতি ঘটে। তিনি বর্তমান

বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ‘দেবীকোট’ নামক স্থানে বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। তিনিই বাংলার প্রথম মুসলিম শাসক। তাঁর সঙ্গী সাথী সৈনিকদের কেউ কেউ ছিলেন আফগানিস্থানের গৌড় প্রদেশের রোহা জেলার অধিবাসী। এরা বাংলার পার্শ্ববর্তী ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যে ভরপুর তৎকালীন আরাকান অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। রোহা জেলার অধিবাসীদের স্থানীয় আরাকানীরা রোহাং নামে ডাকতে শুরু করে। এ রোহাং শব্দটি পরে রোসাং, রোয়াঙ্গা বা রোহিঙ্গা নামে পরিবর্তিত হয়।

“রোহিঙ্গা” নামের উৎপত্তির যে উপাত্ত ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে আর একটি হল : ১৪০৪ সালে আরাকানের রাজা ছিলেন নরমিখলা। বার্মা রাজের সঙ্গে এক পর্যায়ে রাজা নরমিখলার বিরোধ সৃষ্টি হয়। ত্রিশ সহস্রাধিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে বার্মারাজ আরাকান আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রাজা নরমিখলা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়ে গৌড়ের সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৪৩০ সাল পর্যন্ত রাজা নরমিখলা গৌড়ের সুলতানের আশ্রয়ে ছিলেন। সুলতান রাজা নরমিখলাকে সম্মানজনক জীবন যাপনের সুযোগ দান করেন। ইতোমধ্যে গৌড়ে রাষ্ট্র বিপ্লব শুরু হয়। দিনাজপুর জেলার প্রতাপশালী জমিদার রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন। এ সময় জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শারকীকে উত্তরাঞ্চলের বিখ্যাত দরবেশ শেখ আলাওল হকের পুত্র নুর কুতুবে আলম রাজা গণেশকে দমনের জন্য আহবান জানান। নুর কুতুবে আলমের নেতৃত্বে গৌড়ে মুসলিম শাসন অক্ষুণ্ণ রাখার রাষ্ট্রবিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। গণেশের পুত্র ‘যদু’ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে বসেন। যদু সিংহাসনে আরোহণ করে রাজা নরমিখলাকে স্বীয় রাজ্য উদ্ধারকল্পে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ আরাকানে প্রেরণ করেন। গৌড়ের সেনাবাহিনী বার্মা রাজের হাত থেকে ‘আরাকান’ উদ্ধার করে নরমিখলাকে সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায় নরমিখলা তখন ইসলাম গ্রহণ করে মোহাম্মদ সোলায়মান শাহ নাম ধারণ করেন এবং আরাকানের সিংহাসনে বসেন। তখন আরাকানের রাজধানী ছিল লঙ্গিয়াতে। লঙ্গিয়াত আক্রমণ করা বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য সুবিধাজনক ছিল। তাই রাজা

নরমিখলা শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশের প্রধান কেন্দ্রটি নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে রাজধানী চট্টগ্রাম সীমান্তের প্রায় পঞ্চাশ মাইলের কাছাকাছি লেমা নদীর তীরে ‘ম্রোহং’ নামক স্থানে নিয়ে আসেন। ১৪৩৩-১৭৮৫ সাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের অধিক কাল ‘ম্রোহং’ ছিল আরাকানের রাজধানী। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য গৌড়ের সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশকে আরাকানে রেখে দেওয়া হয়। রাজধানী ‘ম্রোহং’ এর পাশ্চাত্য এলাকায় এরা স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকে। এমনভাবে আরাকানের মুসলিম বসতি বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তৎকালীন আরাকানের রাজধানী ‘ম্রোহং’ চট্টগ্রাম ও আরাকানীদের নিকট বিকৃত হতে হতে হয়ে গেছে ‘রাহাং বা রোহিঙ্গা’। মহাকবি আলাওল, কোরেশী মাগন প্রমুখ কবিদের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ‘রোহাঙ্গ’ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ আরব ভৌগলিক সোলায়মান ৮৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ ‘সিলসিলাত-উত-তাওয়ারিক’এ বঙ্গোপসাগরের তীরে রুহমি নামক একটি দেশের পরিচয় দিয়েছেন। এই রুহমি থেকে রুয়াং বা রোহিঙ্গা নামধারণ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।

মিয়ানমারের আদি নাম ও ভৌগলিক অবস্থান

মিয়ানমারের আদি নাম বর্মা বা বার্মা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি প্রাচীন রাষ্ট্র মিয়ানমার। একসময় ব্রহ্মদেশ নামে পরিচিত ছিলো। মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় নাম হলো মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র। রাজধানী ১৯৮৯ সালে তৎকালীন সামরিক জ্যান্তা সরকার বার্মার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম করে মিয়ানমার এবং দেশটির প্রধান শহর ও রেঙ্গুনের নতুন নামকরণ করা হয় ইয়াঙ্গুন। ২১ অক্টোবর ২০১০ সাল থেকে দেশটির জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকা প্রবর্তন করা হয়। মিয়ানমারের মোট আয়তন- ৬ লাখ ৭৬ হাজার ৫৫২ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ হাজার ৮৫ কিলোমিটার। অশ্বখুরাকৃতি পর্বতব্যবস্থা ও ইরাবতী নদরি উপত্যকা দেশটির ভূ-সংস্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। উত্তরের পর্বতগুলির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ হাকাকাবো রাজি-র উচ্চতা ও ৫ হাজার ৮৮১ মিটার। এটি এশিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। আর এই দুটি পর্বতব্যবস্থা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত।

আরাকান ইয়োমা পর্বতমালাটি মিয়ানমার ও ভারতের মাঝে একটি প্রাচীর সৃষ্টি করেছে। এর পর্বতগুলির উচ্চতা প্রধানত ৯১৫ মিটার থেকে ১ হাজার ৫২৫ মিটার পর্যন্ত। অন্যদিকে শান মালভূমি থেকে বিলাউকতাং পর্বতশ্রেণিটি প্রসারিত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব নিম্ন মিয়ানমার এবং দক্ষিণ-পশ্চিম থাইল্যান্ডের সিমন্ত বরাবরে চলে গেছে। ‘শান’ মালভূমিটি চীন থেকে প্রসারিত হয়েছে এবং এর গড় উচ্চতা প্রায় ১ হাজার ২১৫ মিটার।

মুসলিম নিপীড়নের সূত্রপাত

১৪৩৩ সাল থেকে ১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দু’শ বার বছর সময়কালে আরাকানের সিংহাসনে ১৭ জন রাজা অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ঐ সময় আরাকানে মুসলমানদের সোনালী যুগ ছিল। উল্লেখিত ১৭ জন রাজার শাসনামলে আরাকানী মুদ্রায় মুসলিম নীতি অনুসৃত হয়েছিল। মুদ্রাসমূহের এক পৃষ্ঠে কালিমা তাইয়েবা অপর পৃষ্ঠে রাজাদের মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ করা হতো।

মোগল সম্রাট শাহজাহানের শেষ বয়সে, অসুস্থকালীন সময়ে সিংহাসনের দাবি নিয়ে পুত্রদের মাঝে বিরোধ বাধে। যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়। দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব নামে শাহজাহানের চারপুত্র ছিলেন। ২য় পুত্র সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। ১৬৫৯ সালে সুজার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের এলাহাবাদের নিকটে এক যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুজা পরাজিত হয়ে বাংলায় ফিরে আসাকালীন সময়ে সুবাদার মীর জুমলা সুজাকে আক্রমণ করেন। শাহ সুজা তখন আরাকানে আশ্রয় নেন। আরাকানাধিপতি প্রথমে শাহ সুজাকে সাদরে আশ্রয় দান করলেও পরে বেঈমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। আরাকানের মুখ্যমন্ত্রী হবিগঞ্জবাসী মাগন ঠাকুর তখন পরলোক গমন করেছেন। সৈয়দ মূসা ও কবি আলাওল প্রমুখ শাহ সুজার পক্ষে কথা বলায় তাঁদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন নিপীড়ন। আলাওলকে বন্দী করে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়। দীর্ঘদিন কারাবরণ করে তিনি মুক্তি লাভ করেন। আরাকান রাজের শাহ সুজার সঙ্গে অন্যায় জুলুমের প্রতিবাদ করে ঘৃণাভরে আরাকানের প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ মূসা আরাকান ত্যাগ করে তাঁর জন্মভূমি হবিগঞ্জের লক্ষরপুরে আগমন করেন।

শাহ সুজার এক অনিন্দ্য সুন্দরী বিদুষী কন্যাকে রাজা চন্দ্র সুধর্মা বিয়ে করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলে, সুজা এতে সম্মতি না দেওয়ায় এক মর্মান্তক হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয়। সপরিবারে সুজা নিহত হন। যাকে বিয়ে করার জন্য রাজা উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন তাকে উঠিয়ে নিলেও তার প্রাণ নাশের যড়যন্ত্রের কথা তার মনে আসায় পরে তাকেও হত্যা করা হয়। এ জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষিতেই আরাকানের মুসলিম বিদ্রোহী গোষ্ঠী মুসলিম নিধনের সর্বপ্রথম সুযোগ লাভ করে। আরাকানে বসবাসরত নেতৃস্থানীয় মুসলমানগণ ক্রমশ রাষ্ট্রীয় পদ থেকে সরে পড়তে বাধ্য হন।

১৬৬০ সালে শাহ সুজার পরিবার পরিজনের নির্মম হত্যাকাণ্ড থেকে আরাকানের মুসলমানদের উপর নেমে আসে বিষাদের কালো ছায়া। ১৭৮৫ সালে গোটা আরাকানবাসী এক বর্বর হামলার শিকার হয়। বার্মারাজ বোদাপায়া ত্রিশ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে আরাকানের উপর হামলা চালায়। আরাকানরাজ থামান্দারকে বন্দী করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হাজার হাজার আরাকানী সৈন্যকে হত্যা করা হয়। দলে দলে আরাকানীরা নাফ নদী পাড় হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮০২ সালে আবার তৎকালীন স্বাধীন আরাকানের উপর বর্মীরা হামলা চালায়। তখনও রামু, চকরিয়া, টেকনাফ প্রভৃতি এলাকায় আরাকানবাসীরা আশ্রয় নেয়।

বৃটিশ শাসনামলে আরাকান

১৭৫৭ সালের ২ শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইংরেজরা এদেশের (বাংলার) শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিলেও সারা ভারত উপমহাদেশে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আরো প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল সময় ব্যয় হয়। ১৮২৪ সালে ইংরেজরা বার্মার উপর আক্রমণ করে। ১৮২৬ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আরাকান (বার্মা) ইংরেজ প্রশাসনের অধীনে চলে আসে। ১২২ বছর কাল আরাকানসহ বার্মা ইংরেজ শাসনাধীনে থাকার পর ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। এ দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন কলা-কৌশল, জাতিগত, শ্রেণীগত বৈষম্যের

বীজ আরাকানীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আরাকানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিংসার বীজ বপন করা হয়।

সংখ্যার দিক থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পরই মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থান। এরা চারটি দল যথা তামবুকিয়া, তুর্ক-পাঠান, কামাঞ্চি ও রোহিঙ্গা নামে পরিচিত। ১৬৬৬ সালে চট্টগ্রামের পতনের পর আরাকান রাজ্য সংকুচিত হয়ে একটি ছোট্ট অঞ্চলে পরিণত হয় এবং রাজনৈতিকভাবে বেশ অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। ১৭৩১ থেকে ১৭৮৪ সালের মধ্যে আরাকান রাজ্যকে ১৩ জন রাজা শাসন করেন। ১৭৮৪ সালে বোদাউপায়ার (১৭৮২-১৮১৯) সময়ে আরাকান রাজ্য বার্মা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় এবং ১৮২৬ সালে এটি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অংশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এটি সাময়িকভাবে জাপানের দখলে ছিল।

আরাকান মুসলমানদের বিপর্যয়

১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ বার্মায় এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। মগদের আক্রমণে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের প্রাণহানী ঘটে। সবচেয়ে বেশী মুসলমান হতাহত হয় আরাকানে।

১৯৪২-৪৫ এই তিন বছরে কমপক্ষে ২০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে তৎকালীন বাংলায় চলে আসে। সেই যাত্রা এখনো থামেনি। ১৯৪৫ সালে ব্রিটিশরা আবারও মিয়ানমার দখল করে নেয়। এই দখলে তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রোহিঙ্গারা। ব্রিটিশরা এ সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সহায়তার বিনিময়ে উত্তর রাখাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাজ্য গঠন করে দেবে তারা। কিন্তু আরো অনেক প্রতিশ্রুতির মতোই ব্রিটিশরাজ এই প্রতিশ্রুতিও রাখেনি। ইংরেজ বড় লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন এর পরিকল্পনা মতে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। অতঃপর ১৯৪৮ সালে বার্মা থেকে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পরই বর্মী সৈন্য ও পুলিশের সমর্থনপুষ্ট স্থানীয় মগ অধিবাসীরা আবার রোহিঙ্গা মুসলমানের উপর নির্যাতন শুরু করে।

এরপর থেকেই একটি সুপরিকল্পিত পরোক্ষ প্ররোচনা ও উস্কানির মাধ্যমে ধীরে ধীরে আরাকানী মুসলমানদের স্বীয় আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলে। গণহত্যা শুরু হলে বহু রোহিঙ্গা মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে চলে আসেন। দাঙ্গার অবসান ঘটলে তারা স্বদেশে গিয়ে দেখলো তাদের বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি শত্রুদের দখলে চলে গেছে। অনোন্যোপায় হয়ে তারা আবার নতুন জায়গায় বসবাস শুরু করেন। আরাকানের জনসংখ্যানুপাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা তখন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের দাবী তুলেছিল। তৎকালীন বার্মার প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, জাতিসত্তার উপর ভিত্তি করে সংখ্যালঘুদের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। কিন্তু ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট নেউইনের ক্ষমতা গ্রহণের পর তা আর হলো না। ১৯৬২ সালেই বার্মার অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল নেউইন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্ম দেন। এরপর থেকে আরাকানীদের উপর চলে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী সরকারের শাসন। আর বার্মার অন্যান্য এলাকায় ছিল স্থানীয় বৌদ্ধ মগদের শাসন। মুসলমানরা স্থানীয়ভাবে নিজেদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে তার নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার থেকে আরাকানের মুসলমানদের বিচ্যুতি করা হলো। ১৯৬৪ সালে এক সরকারী আদেশ বলে জাতীয় করণের নামে বিত্তশালী মুসলমানদের বিষয় সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা, দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, যানবাহন ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মুসলমানের উপর চলে আইন-কানূনের কড়াকড়ি। জানা যায় ১৯২৩ সাল হতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বার্মার মুসলমানরা হজে যাওয়ার কোন সুযোগ পায়নি। ১৯৮০ সালে মাত্র ৭০ জন লোককে হজে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়। বর্তমানে বার্মার মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষের উপরে। এর মধ্যে শুধু আরাকানেই মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ২২ লক্ষের মত। বার্মার মোট জনসংখ্যানুপাতে মুসলমানদের স্থান দ্বিতীয়।

রাজনৈতিক বৈষম্যের স্বীকার

১৫ অক্টোবর ১৯৮২ সালে মিয়ানমারের সামরিক জ্যান্টা নাগরিকত্বের কালো আইন প্রকাশ করে। এই আইনের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘদিন ধরে আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানেরা নিপীড়নের শিকার হয়। মায়ানমারে বাস করা ১৩৫টি গোত্রভুক্ত মানুষই মিয়ানমারের পূর্ণ নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। মিয়ানমারে তিন ধরনের নাগরিকত্বে বিধান রাখা হয়তো পূর্ণাঙ্গ, সহযোগী এবং অভিবাসী। তবে আরাকানের মুসলমানদেরকে নাগরিক হিসেবে অস্বীকার করে অভিবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়। এর পর থেকেই ছলে, বলে, কৌশলে এক এক করে তাদের নাগরিকত্ব ও মৌলিক অধিকার হনন করা শুরু হয়। মিয়ানমারের ইতিহাস থেকে জানা যায় মিয়ানমারের পার্লামেন্টে অতীতে মুসলমান রোহিঙ্গারা আরাকান থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদের নাম-দামও বিভিন্ন সময়ে মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। তারা যদি মিয়ানমারের নাগরিক না হয়ে থাকেন, তাহলে তারা মিয়ানমারের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কীভাবে? আসলে মিয়ানমার সরকার একটি কৌশল অবলম্বন করেছে যাতে যেকোন ভাবে তারা আরাকানকে মুসলমান শূন্য করতে চায়। ‘মানবাধিকার’ নামে যে শব্দটি আছে, অনেকের কাছেই মনে হতে পারে এখন তা ডিকশনারির শব্দ। অন্তত রোহিঙ্গা নির্যাতনের চিত্র আমাদের তা-ই ভাবতে সাহায্য করে। মানুষের প্রতি সরকারের আচরণ কতটা নির্মম হতে পারে, তারই যুগ যুগ ধরে একটি বাস্তব উদাহরণ বর্তমানের রোহিঙ্গা নির্যাতন। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের বিষয় হচ্ছে, বাকি সব নাগরিক অধিকার সংকুচিত করে ফেলেও ১৯৯০ সালের নির্বাচনে রোহিঙ্গাদের ভোটাদিকার দেওয়া হয়। বর্মা সরকার এবং সে দেশের সেনাবাহিনী বর্তমানে বেশ জোরেশোরেই বলে থাকে আরাকানের রোহিঙ্গারা সে দেশের নাগরিক নয়, বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মানুষ। এই দাবি যে কত স্ববিরোধী তার স্বপক্ষে বহু তথ্য-উপাত্তই দেয়া যায়। এখানে কেবল এটাই উল্লেখ করছি যে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৯০ সালে সুলতান মাহমুদ, আবুল বাশার, আব্দুল গাফ্ফার, জোহরা বেগম খ মিং (শামসুল আনোয়ার) (বুখিডং-১) মো. নূর আহমেদ (বুখিডং-২) উ চিট লুইঙ (ইব্রাহিম, মংডু-১) ফজল আহমেদ

(মংডু-২) প্রমুখ যে আরাকানের মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো থেকে এমপি নির্বাচিত হয়ে দেশটির পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বছরের পর বছর (মন্ত্রীও হয়েছিলেন!)। প্রশ্ন হলো এই ব্যক্তির মিয়ানমারের নাগরিক না হলে কীভাবে নির্বাচনে দাঁড়ালেন এবং জয় লাভ করলেন? আজ সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবারগুলো শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশসহ নানান দেশে মানবেতর জীবনযাপন করছে।

এমনকি ১৯৯০-এ যখন সামরিক বাহিনীর অধীনেই বর্মায় বহু দিন পর প্রথমবারের মতো বহুদলীয় নির্বাচন হলো (যে নির্বাচনে অং সান সুচির দল নির্বাচিত হয়েও সরকার গঠন করতে পারেনি) কীভাবে তখন রোহিঙ্গারা নিজস্ব রাজনৈতিক দল (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এন্ড হিউম্যান রাইটস পার্টি) থেকেই প্রার্থী হতে অনুমতি পেয়েছিল? আইন অনুযায়ী ঐ নির্বাচনে ‘বিদেশী’ ছাড়া সকলকেই ভোট দিতে দেয়া হয়েছিল। তাহলে বুথিডং ও মংডুর এই রোহিঙ্গারা কাদের ভোটের নির্বাচিত হয়েছিলেন?

তথ্য মতে উপরের প্রথম চারজন এমপি’র মধ্য থেকে শামসুল আনোয়ারকে অং সান সুচি ১৯৯৮ সালে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধি হিসেবে ‘পিপলস পার্লামেন্টে’ যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ জানান এবং শুধু এই ডাকে সাড়া দেয়ার কারণে জ্যান্তা সরকার তাকে ৪৭ বছরের জেল দিয়েছে। এমনকি তাঁর পুত্র-কন্যাদেরও ১৭ বছর করে সাজা দেয়া হয়। অথচ এখন সুচিও উত্তর আরাকানে রোহিঙ্গাদের কোনরূপ উপস্থিতির কথা অস্বীকার করে থাকেন!

এই নির্বাচনে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় অং সাং সুচির নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) বিজয়ী হয়। মিয়ানমারের এই নির্বাচনে এনএলডি ৪৮৫টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসন পেলেও জ্যান্তা সরকার সুচির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসে। এতে করে মিয়ানমারজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ। ২১টি এথনিক গ্রুপ মিলে তৈরি হয় ‘ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স অব বর্মা’ যা ড্যাব নামে পরিচিতি পায়। ড্যাব ঘোষণা করে, সামরিক সরকারের হাত থেকে গণতন্ত্র ছিনিয়ে আনতে তারা সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করবে। রোহিঙ্গাদের দুটি সংগঠন অল বর্মা মুসলিম ইউনিয়ন এবং আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক

ফ্রন্টও যৌথ বিবৃতিতে জানায়, তারাও সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে शामिल হবে। সামরিক একনায়করা যা করে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জনরোষকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পর্যবসিত করতে আক্রমণ শুরু হয় রোহিঙ্গাদের ওপর। উক্ষে দেওয়া হয় স্থানীয় বর্বর রাখাইনদের। একই সঙ্গে চলে সামরিক অভিযান। নির্যাতন মাত্রা ছাড়া করে রোহিঙ্গাদের আরেকবার ঠেলে দেওয়া হয় বাংলাদেশের দিকে।

রাষ্ট্রহীন এক জনগোষ্ঠী

২৮ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের গোত্র হিসেবে অস্বীকার করে সামরিক সরকার। তারা দাবি করে ‘রোহিঙ্গা’ বলে কোন গোত্র তাদের দেশে নেই, এই জনগোষ্ঠী আসলে পূর্ব বাংলা থেকে যাওয়া অবৈধ জনগোষ্ঠী, যারা ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরবর্তী মিয়ানমারে আশ্রয় নিয়েছে। নতুন আইন অনুযায়ী তারা মিয়ানমারের নাগরিক হতে পারবে না। মিয়ানমারের সামরিক সরকার ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগকে অস্বীকার করে। আইনে ‘সহযোগী নাগরিক’ হিসেবে শুধু তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয়, যারা ১৯৪৮ সালের নাগরিকত্ব অ্যাক্টে ইতিমধ্যেই আবেদন করেছে। এ ছাড়া ‘অভিবাসী নাগরিক’ (মিয়ানমারের বাইরে জন্ম নিয়েছে এমন মানুষদের নাগরিকত্ব) হিসেবে কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়, যেগুলো ‘যথাযোগ্য ভাবে প্রমাণসাপেক্ষ’ বলে বলা হয়, যারা মিয়ানমারের স্বাধীনতার আগে (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮) এ দেশে প্রবেশ করেছে, মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় ভাষায় দক্ষ এবং যাদের সন্তান মিয়ানমারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারাই এই ধারায় নাগরিকত্ব পেতে পারে। যুগ যুগ ধরে আরাকানে থাকা রোহিঙ্গাদের পক্ষে ১৯৪৮ সালের আগে প্রবেশ করা সংক্রান্ত কোন দালিলিক প্রমাণ উপস্থাপন করা ছিল অসম্ভব। এছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা প্রধানত নিরক্ষর এই জনগোষ্ঠীর পক্ষে মিয়ানমারের রাষ্ট্রভাষায় ‘দক্ষতা’ প্রমাণ হয়ে পড়ে দূরহ; কারণ রাষ্ট্রীয়ভাবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন যে ‘কেন্দ্রীয় কমিটি’ এই নাগরিকত্ব প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল, তারা প্রায় প্রকাশ্যেই রোহিঙ্গাদের প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখায়।

সুতরাং রোহিঙ্গারা আর নাগরিকত্ব পায় না। তারা হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু, কয়েক পুরুষ ধরে বাস করা নিজেদের পূর্ব পুরুষের হাজার বছরের ভিটেমাটিতে তারা হয়ে পড়ে কয়েদি। বিশ্বের বুকে জন্ম নেয় রাষ্ট্রবিহীন সবচেয়ে বড় জনগোষ্ঠী।

তেরঙা কার্ডে ঠাঁই হয়নি

১৯৮৯ সাল থেকে মিয়ানমার তিন ধরনের নাগরিক কার্ডের প্রচলন করে। পূর্ণাঙ্গ নাগরিকদের জন্য গোলাপি, সহযোগী নাগরিকদের জন্য নীল এবং অভিযোজিত নাগরিকদের জন্য সবুজ রঙের কার্ড দেওয়া হয়। চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পড়াশোনা-চিকিৎসাসেবাসহ সব ধরনের কাজকর্মে এই কার্ডের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের কার্ড দেওয়া হয় না। এর ফলে রোহিঙ্গাদের পক্ষে মিয়ানমারে টিকে থাকা দূরহ হয়ে পড়ে। ১৯৯৪ সাল থেকে রোহিঙ্গা শিশুদের জন্মনিবন্ধন বন্ধ করে দেয় মিয়ানমার সরকার। পরে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক হাইকমিশনের চাপে রোহিঙ্গাদের তালিকাভুক্ত করার উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। এ সময় রোহিঙ্গাদের দেওয়া হয় সাদা কার্ড, যেখানে জন্মস্থান এবং তারিখ লেখা হয় না। এর ফলে এই কার্ড মিয়ানমারের নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না এবং রোহিঙ্গাদের কোনো কাজেও আসে না। কয়েক বছর পর এই কার্ডও বন্ধ করে দেয় সরকার। রোহিঙ্গাদের নাম শুধু তালিকাভুক্ত করে রাখা হয় নাসাকা বাহিনীর খাতায়।

নিজ গ্রামের উন্মুক্ত কারাগারে

মিয়ানমার জ্যাস্তা রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। আর তাই তাদের (মগ/বৌদ্ধ) ভাষায় 'বহিরাগত' হিসেবে চিহ্নিত এসব রোহিঙ্গাদেরকে রাখা হয়েছে কারাগারে। রোহিঙ্গাকে বন্দি করার মতো বড় কারাগার মিয়ানমার তৈরি করতে পারেনি, তাই রোহিঙ্গারা নিজ গ্রামেই বন্দি। মিয়ানমারের অন্য কোনো অঞ্চলে যাওয়ার কথা তো দূরের কথা, পাশের গ্রামে যাওয়ারও কোনো অনুমতি নেই তাদের। নিজ গ্রামের বাইরে

যেতে হলে তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকার কাছ থেকে ট্রাভেল পাস নিতে হয়। এই ট্রাভেল পাস নিয়েই তারা গ্রামের বাইরে যেতে পারে। কিন্তু ট্রাভেল পাস পাওয়া কঠিন বিষয়। এ জন্য নাসাকাকে দিতে হয় বড় অঙ্কের ঘুষ। তারপরও রক্ষা নেই। যদি ট্রাভেল পাসে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ গ্রামে ফিরতে ব্যর্থ হয় কোন রোহিঙ্গা, তা হলে তার নাম কাটা যায় ওই গ্রামের তালিকাভুক্তি থেকে। সে তখন নিজ গ্রাম নামের কারাগারেও অবৈধ হয়ে পড়ে। তাদের ঠাঁই হয় জ্যাস্তা সরকারের জেলখানায়।

বিয়েতে বাধা, সন্তান ধারণে নিয়ন্ত্রণ!

১৯৯০ সালে আরাকান রাজ্যে স্থানীয় আইন জারি করা হয়। আইনটিতে উত্তর আরাকানে বাস করা মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই আইন অনুযায়ী এই অঞ্চলে বাস করা রোহিঙ্গাদের বিয়ের আগে সরকারি অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। এই অনুমোদনের দায়িত্বে রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাসাকা। সাধারণত বিয়ের অনুমোদন পাওয়া খুবই কঠিন। সরকারি ফির পাশপাশি এ জন্য বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে হয় নাসাকার লোকজনকে। তার পরও বিয়ের অনুমতি পেতে অধিকাংশ সময় বছরের পর বছর চলে যায়। এই অনুমোদন পাওয়া খুব কষ্টকর এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তাই রোহিঙ্গাদের পক্ষে বৈধভাবে বিয়ে করার হার খুবই কম। রোহিঙ্গারা নিজ গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে করতে পারে না। যদিও মিয়ানমারে এ রকম কোনো রাষ্ট্রীয় আইন নেই, তবু রোহিঙ্গারা নিজেদের বাইরে স্থানীয় কারো সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন আইনের ফাঁকে ফেলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল দেওয়ার নজির আছে।

২০০৫ সালে নাসাকা বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। এ সময় দীর্ঘদিন বিয়ে সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণ করা বন্ধ করে দেয় নাসাকা। পরের বছর যখন আবার আবেদন গ্রহণ চালু হয়, তখন নিয়মকে করা হয় আরো কঠোর। তখন থেকে আবেদনের সঙ্গে নবদম্পতিকে মুচলেকা দিয়ে বলতে হয় যে এই দম্পতি দুইয়ের অধিক সন্তান নেবে না।

তবে দীর্ঘদিন ধরে বৈধভাবে বিয়ে করতে বাধার সম্মুখীন হওয়ায় রোহিঙ্গাদের পারিবারিক জীবন হয়ে পড়েছে অমানবিক। বিয়ের জন্য তথাকথিত অনুমোদন পাওয়ার আগেই যেসব রোহিঙ্গা মুসলিম ধর্মমতে বিয়ে করছে, তারা সন্তান নিতে পারছে না। কেউ সন্তান ধারণ করলে তাকে গোপনে গর্ভপাত করাতে হচ্ছে। তার পরও যেসব শিশুর জন্ম হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো বেধ দম্পতির সন্তান হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে হচ্ছে। এমন ভুরি ভুরি নজিরও আছে, যেখানে রোহিঙ্গা দম্পতি নিজেদের সন্তানকে তাদের বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে তালিকাভুক্ত করাতে বাধ্য হয়েছে। অনেকেই সন্তান ধারণ করলে বাংলাদেশে চলে গেছে এবং সেখানেই বাংলাদেশে বসবাসকারী উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের কাছে সন্তানকে রেখে আবার ফিরে এসেছে। চলতি সপ্তাহেও একটি পরিত্যক্ত নৌকা থেকে এরকম এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী।

চিকিৎসায় বাঁধা প্রদান

রোহিঙ্গাদের জন্য মিয়ানমারের নাগরিক অধিকার অনেক দূরের ব্যাপার, সরকারি চাকরি তাদের জন্য নিষিদ্ধ। উত্তর আরাকানের সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে রোহিঙ্গাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্যসেবা চালু আছে। কিন্তু এসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রাখাইন এবং বার্মিজ নাগরিকরা স্থানীয় রাখাইন ভাষায় কথা বলার কারণে রোহিঙ্গারা সেখানে গিয়ে পূর্ণ চিকিৎসা নিতে পারে না। সরকারি বড় হাসপাতালে তাদের প্রবেশ পদ্ধতিগতভাবে নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবার উদ্যোগ নিতে পারে না। এমনকি রোহিঙ্গা মহিলাদের জরুরি ধাত্রীবিদ্যা শেখানোর উদ্যোগ নিয়েও মিয়ানমার সরকারের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেবা সংস্থাগুলো।

চলাচলে নিয়ন্ত্রণ আরোপের কারণে রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এমনকি অতি গুরুতর অসুস্থ রোগীকেও গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতে হলে আগে ট্রাভেল পাসের জন্য অনুমতি নিতে

হয়। এ কারণে অনেক রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চিকিৎসা নিতে বাংলাদেশে চলে আসে। এদের অধিকাংশই আর ফিরে যায় না।

শিক্ষায় সীমিত অধিকার

শিক্ষার ক্ষেত্রেও রোহিঙ্গারা বৈষম্যের শিকার। ধীরে ধীরে তাদের অধিকার সংকুচিত করে ফেলেছে মিয়ানমার সরকার। রোহিঙ্গাদের মধ্যে অশিক্ষার হার ৮০ শতাংশ, যা মিয়ানমারের সাধারণ অশিক্ষার হারের দ্বিগুণ। উত্তর আরাকানের রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে এমনিতেই মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা খুব কম; কিন্তু গ্রামের বাইরের সেই স্কুলগুলোতে পড়তে গেলেও ট্রাভেল পাস নিতে হয় রোহিঙ্গা শিক্ষার্থীদের। একসময় আরাকান রাজ্যে শতাধিক মাদরাসা ছিল। বার্মিজ সরকারের চাপে এক এক করে সব মাদরাসা বন্ধ হয়ে যায়। চল্লিশের দশক থেকে আলেম উলামা ও রাজনীতিবিদদের উপর নেমে আসে পরিকল্পিত নির্যাতনের স্টীম রোলার। এক পর্যায়ে আরাকানের তরুণদের উচ্চ শিক্ষা পেতে অনুমোদনও বন্ধ করা হয় ২০০১ সালে। তখন থেকে শুধু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ঘরে বসে রোহিঙ্গারা উচ্চশিক্ষা পেতে পারত এবং পরীক্ষা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারত। ২০০৫ সাল থেকে এই নিয়মও বন্ধ করে দেয় মিয়ানমার জ্যাম্বা।

বন্দী আরাকান

দক্ষিণ প্রাচ্য বা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি রাজ্য। তার সীমানা উত্তরে চীন দক্ষিণে থাইল্যান্ড পূর্ব ও পশ্চিমে বাংলাদেশ। তাতে ইসলাম প্রবেশ করেছে বহু বছর আগে। আমীরুল মু'মিনীন হারুনুর রশীদ রহ. এর শাসনামলে যখন মুসলিম বণিকগণ পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লেন, তাদের হাতে ইন্দোনেশিয়া ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করলো। ফিলিপাইনেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো। তখন এসকল দেশগুলোর সাথে আরেকটি দেশের নাম পাওয়া যায় তা হলো আরাকান। ২৭২ হিজরিতে ১২শত বছর পূর্বে ইসলাম প্রবেশের পর তার হাজার হাজার অধিবাসীদের অন্তরে স্থান করে নিল। সবাই ইসলামি ধর্মমত মেনে চলতে শুরু করলো। মুসলিম শাসকগণ

তাদেরকে শাসন করত। তারা অনেক মসজিদ নির্মাণ করে। ইলমী হালকাসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের বাচ্ছাদেরকে কুরআন হিফজ করাতে লাগল। তারা একটি মুদ্রাও চালু করলো। যার উপর লিখিত ছিল لا اله الا الله তারপর তার নীচে লিখিত ছিল 'আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী'। ওরা বিশুদ্ধ ও সহীহ আকিদাহ মানহাজের অনুসারী মুসলিম ছিল। এভাবে বহু শতাব্দী পর্যন্ত তারা ইসলামের উপর চলতে থাকে। ইসলাম এখানকার লাখ লাখ মানুষের পর এর আশে-পাশের দেশগুলোতেও ছড়াতে থাকে। এর পাশের দেশ ছিল বার্মা একটি বৌদ্ধ রাষ্ট্র। কেউ সেখানে প্রবেশ করলে সর্বত্র বড় বড় বৌদ্ধ মূর্তি দেখতে পেত। বৌদ্ধরা সেগুলোর সেজদা করতো। সর্বত্র বৌদ্ধদের উপাসনালয়গুলো দেখতে পেত। বৌদ্ধদেরকে দেখতো কমলা রঙ্গের চাঁদর, লুঙ্গি, মূর্তির মাথাও নগ্ন পায়ে তার চতুরপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করছে। মানুষকে বৌদ্ধ মতবাদ ও মূর্তি পূজার প্রতি আহ্বান করছে। ইসলাম এদেশে তথা বার্মা ও অন্যান্য অঞ্চলে প্রসার করতে লাগল। তখন বৌদ্ধরা মুসলিমদের উপর হিংসা পরায়ণ হয়ে উঠলো। মুসলিমদের উপর আক্রমণ করলো। মুসলিমগণ ছিলেন সংখ্যালঘু আর তারা ছিল লাখ লাখ। ফলে তারা মুসলিমদেরকে শাস্তি দিতে লাগলো। তাদের দেশ দখল করে নিল। আরাকান কে বার্মার সাথে যুক্ত করে নিল। তারা সেখানে মুসলিমদের সাথে যা ইচ্ছা তাই করতে লাগলো। মুসলিমগণ সেখানে স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকারী ছিল। আর তা ছিল প্রায় ২শ বছর পূর্বে। অতপর তখন এই দখল দারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিমগণ স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিকারী থাকার পর তারা হয়ে যায় সংখ্যালঘু। এমন একটি রাষ্ট্রের অধীন হয়ে যায়, যেখানে ৫০ লক্ষ বৌদ্ধ আর মুসলিমদের সংখ্যা হয়ে যায় ১শ এর মধ্যে ১৫ জন অর্থাৎ তিন-চার লাখের মতো। কিন্তু এই সংখ্যাও ফেলে দেওয়ার মতো ছিলনা। মুসলিমগণ নিজেদের অনেক জনপদ কেড়ে নেয়। তারা তাদের মসজিদ সমূহে ইবাদত-বন্দেগী পালন করতে থাকতো। তাদের আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জন্য কল্যাণ ও ইসলামের পথে আহ্বানকারী হয়ে যায়। ফলেই বর্মী বৌদ্ধ গোষ্ঠীরা বার্মার মুসলিম বসতিগুলোর উপর আক্রমণ করতে লাগলো। তাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি

করতে লাগলো এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। যেন তারা বাংলাদেশ বা অন্য কোন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। এমনকি বিভিন্ন সময় মিলে তাদের ১লক্ষ ৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করে। তারপর তাদের মাঝে ও মুসলিমদের মাঝে টানাপড়েন চলতে থাকে। অতঃপর আর কখনো মুসলমানগণ তাদের নিরাপত্তা ফিরে পায়নি। এমনকি তারা পুনরায় ৬০ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে এবং ৫০ হাজার মুসলিমদের উপর অবরোধ আরোপ করে। মুসলিমদের অবস্থা এমন হয়ে পড়ে যে, তারা কোথায় যাবে! তাই ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর নানা দেশে, তাদের এমন সব দেশেও আশ্রয় দিতে বাধ্য হয়। যেগুলো তাদের দেশের মত বা তার থেকে অধিক দরদি আর বৌদ্ধরা জনপদের পর জনপদে তাদেরকে হত্যা করতে থাকে এবং তাদের উপর এমন আইন কানুন আরোপ করতে থাকে। যা তাদের জন্য পরিস্থিতি সংকীর্ণ করে তোলে। ফলে তারা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রথমে তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করতে নিষিদ্ধ করা হয়। আর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আহ্বান করার জন্য তারা অসংখ্য বৌদ্ধ উপাসনালয় বানাতে থাকে এবং তার ভিতর মূর্তি পূজা করতে থাকে। মুসলিমদের উন্নতির পথ বন্ধ করে দেয়। আর তাদের মনমত এমন সব আইন-কানুন পাশ করে যার মাধ্যমে একথা বুঝা যায় যে তাদের জাতীয়তা বার্মীয়া। বামিরা দীর্ঘদিন ধরে তাদেরকে গ্রাস করে রাখার পর তারা হয়ে গেল বার্মি। ফলে বিগত বছরগুলোতে সরকার তাদেরকে ভিষনভাবে চাপ দিতে থাকে। তারা একেবারে নিশ্চয়তাহীনভাবে জীবন-যাপন করতে থাকে। মুসলমানদেরকে বার্মা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তারা যে কোন চাকরীতে যুক্ত হওয়া নিষিদ্ধ। তাদেরকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। তারা শুধু প্রাথমিক লেখা-পড়া শিখতে পারবে। যেন বৌদ্ধদের চাকর হিসেবে থাকতে পারে এবং তাদেরকে কোন মুদি ব্যবসা বা এ জাতীয় কাজে প্রেরণ করলে তাদের জন্য চিঠি পড়ে দিতে পারে। মুসলমানদেরকে চাকরের কাজ করতে বাদ্য করে। ফলে তারা গ্রামে এসে তাদের যুবকদের ব্রীজ নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণের কাজকর্ম সামরিক ক্যাম্প নির্মাণ, কাপড় পরিষ্কার ইত্যাদি

কাজে নিয়োজিত করে। কিন্তু এর বিনিময়ে তাদেরকে একটুকরো রুটিও দেয়া হত না। তাদেরকে শুধু যথেষ্ট পরিমাণ খরচ দেয়া হত না। শুধু এমন নয়, বরং এমনকি তাদেরকে সামান্য খাদ্যও দেয়া হত না। মুসলিমদেরকে আদেশ করা হতো, যেন যখনই তাদের প্রয়োজন হয় তখনই তাদের জন্য পরিপূর্ণ খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করা হয়। আর যে এটা করবে না তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। এদের সংখ্যা অনেক। এ কারণে যখন বলা হয় ৬০-৭০ হাজার হত্যা করা হয়েছে। তার অর্থ হলো একজন যুবক এসে বলেছে আমার কাছে কোন খাদ্য নেই, কোন পানীয় নেই, তখন তাকে এই বলে হত্যা করা হয়েছে যে, তুমি কোন খাবার নিয়ে আসনি? তাদের উপর ভ্রমনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় অর্থকড়িও নেই, এমন কি হজ্জ ও ওমরা করতে পারে না।

মূল : ড. মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফী

ভাষান্তর : মাওলানা আখলাক আহমদ

শরণার্থী সমস্যা

বাংলাদেশে প্রথম উদ্বাস্তু ঢেউ ১৯৭৪ সালে জ্যোন্তা সরকার চালু করে ইমার্জেন্সি ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট। এই অ্যাক্টে বলা হয়েছে ভারত, চীন ও বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করাই আইনের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক নাগরিকের জন্য নাগরিক কার্ড বহন করা বাধ্যতামূলক করা হয়। কিন্তু এ সময় কোনো রোহিঙ্গাকে নাগরিক কার্ড দেওয়া হয় না, তাদের ছেওয়া হয় ‘অভিবাসী কার্ড’; যে কার্ড প্রমাণ করে যে তারা মিয়ানমারের নাগরিক নয়। প্রথমদিকে এ রকম কার্ডে কোনো সমস্যা বোঝা না গেলেও, আসল সমস্যা শুরু হয় কয়েক বছর পর। ১৯৭৭ সালে সামরিক সরকার শুরু করে ‘অপারেশন নাগামিন’ বা ‘ড্রাগন রাজ’। এই অপারেশনে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করার নামে রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায় মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও স্থানীয় রাখাইনরা। ১৯৭৮-১৯৯৯ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে সাত-আট লাখ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পাকিস্তান আমলেও বার্মা সরকারের সাথে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা

হয়েছে। কিন্তু আদৌ কোন ফল হয়নি। স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে সত্তরের দশকের শেষ ভাগ (১৯৭৮ সালে) থেকে আজ পর্যন্ত লাখ লাখ মুসলমান আরাকান (বার্মা) থেকে বিতাড়িত হয়ে বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। তখন বার্মার উদ্বাস্তু সমস্যাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উপস্থাপিত হয়। জাতীয় পত্র-পত্রিকা গুলো বিশেষ তৎপর হয়ে উঠে। যার ফলে বার্মা সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়। বাকীরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে থেকে যায়। এক দশক অতিক্রান্ত হতে না হতে নব্বই এর দশকের শুরু থেকেই আবার একই সমস্যার উদ্ভব হয়। নাফ নদী পেড়িয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশে আসতে থাকে সহায়, সম্বল সবকিছু হারিয়ে হত্যা, ধর্ষণ আর নির্যাতনের শিকার হয়ে হাজার হাজার আরাকানী মুসলমান। জানিনা আরাকানী মুসলিম ভাইদের এ দৃশ্যপট কবে বিশ্ব বিবেকে সাড়া জাগাবে? সরকারি হিসাব মতে জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী ৫-১০ লাখেরও অধিক শরণার্থী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রোহিঙ্গা সংকট নতুন করে উপস্থিত হয়। একেক করে বার্মা সরকার আরাকানিদেরকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করতে থাকে। এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে এই বার্মা, বর্তমান মিয়ানমারের মিলিটারি জ্যোন্তা এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৭৪ সালে রোহিঙ্গাদের উপর আরাকান সরকার নির্যাতন শুরু করলে দলে দলে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। সেসময় ১৯৭৪ সালেও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোর ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় মিয়ানমারের সংখ্যালঘু নিধন অভিযান বন্ধে সামরিক জ্যোন্তাকে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপরিবারে নির্মম হত্যার পর বিভিন্ন উত্তান পতনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসেন মেজর জেনারেল (অব) জিয়াউর রহমান। ১৯৭৮ সালে এ রোহিঙ্গাদের আবার বিতাড়ন করা শুরু করেছিল। জাতিসংঘের প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে

রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের সীমান্ত খুলে দেন এবং সমস্যা সমাধানের কূটনৈতিক চেষ্টা করেন। তখন বার্মা থেকে পালিয়ে আড়াই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ চেষ্টা করে। এরপর তারা ১৯৮২ সালে যে ‘সিটিজেন আইন’ করে, সে আইনে একটা চার স্তরবিশিষ্ট সিটিজেনশিপ প্রয়োগ করে। এটা করার উদ্দেশ্যই ছিল এদের অধিকারটা কেড়ে নেওয়া। এরপর ১৯৯১-৯২ সালে খালেদা জিয়ার শাসনামলে রোহিঙ্গাদের উপর মিয়ানমারের আধা-সামরিক বাহিনী নাসাকা এবং অন্যান্য জঙ্গি বৌদ্ধ সংগঠন সম্মিলিত আক্রমণে নতুন করে ৩ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১৯৯১-৯২ সালে যারা এসেছিল তাদেরও কিছু লোককে তখন ফেরত নেওয়া হল। কিন্তু তখন কিছু রোহিঙ্গা থেকে যায়। সেখানে সেই সময়ে রেজিস্টার্ড প্রায় ২৫ হাজারের মতো ছিল আর আন-রেজিস্টার্ড বেশকিছু তারা নিয়ে গিয়েছিল। এ সময় থাইল্যান্ড এবং বিশেষ করে মালয়েশিয়াতেও ব্যাপকসংখ্যক রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটে।

২০১২ সালে একদফা আবার এই রোহিঙ্গারা নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আমাদের দেশে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। কারণ তাদের উপর একটা অমানবিক অত্যাচার শুরু হল। এরপর ২০১৫-১৬ সালে, আবার এই ২০১৭ সালে এখন ব্যাপক হারে এসেছে। নির্যাতন এমন পর্যায়ে এখন গেছে যে, যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যখন মানুষ আসতে শুরু করেছে আমরা দেখেছি নারী, শিশুই বেশি। নৌকাডুবি হয়ে সেখানে শিশুর লাশ নাফ নদীতে ভাসছে। এমনকি গুলি খাওয়া, মাথায় এবং বুকে গুলি খাওয়া লাশ নদীতে অথবা সাগরে ভেসে উঠছে। সেখানে আগুন দিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে।

বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নির্যাতনের স্বীকার হয়ে বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়ের ঢল নামে বাংলাদেশের দিকে। সম্প্রতি আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজার উল্লেখ করেছে। তবে বাংলাদেশের গণমাধ্যম সম্প্রতি ৩ লক্ষ নতুন শরণার্থী প্রবেশ করেছে বলে ধারণা করেছে। তবে জাতিসংঘ বাংলাদেশে শরণার্থী সংখ্যা ১০ লাখে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে ধারণা করেছে। পাকিস্তানে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৩ লক্ষ, থাইল্যান্ডে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৫ হাজার, সৌদি আরবে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ২ লক্ষ, ভারতে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ৪০ হাজার, সংযুক্ত আরব আমিরাত রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ১০ হাজার, মালয়েশিয়া রোহিঙ্গা শরণার্থী সংখ্যা ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ইন্দোনেশিয়ায় ১ হাজার, রাখাইনে নিবন্ধিত ১ লক্ষ ৪০ হাজার, অনিবন্ধিত মিয়ানমারের রাখাইনে এই অবস্থা চলতে থাকলে বছরের শেষ নাগাদ ১০ লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসতে পারে বলে মনে করছে জাতিসংঘ।

সম্প্রতি কক্সবাজার পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ শঙ্কার কথা জানান আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার অপারেশন্স অ্যান্ড ইমার্জেন্সি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মেদ আবদিকার মাহমুদ এবং জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআর’র সহকারী হাই কমিশনার জর্জ ওকোথ-ওকোবা। এ সময় শরণার্থীদের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে আন্তর্জাতিক সহায়তার অনুরোধ জানিয়ে আবদিকার মাহমুদ বলেন, “আমাদের উদ্বেগ বাড়ছে।” গত ২৫ অগাস্ট থেকে শুরু হওয়া রোহিঙ্গা ঢলে নতুন করে প্রায় চার লাখ শরণার্থী বাংলাদেশে আসায় যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা সামাল দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনও যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। এই সংকটে বাংলাদেশ সরকার যে জরুরি সাড়া দিয়েছে তার প্রশংসা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, “আরও অনেক কিছু করতে হবে।” ওকোথ-ওকোবা বলেন, আড়াই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় চার লাখ মানুষ আসায় বাংলাদেশ গুরুতর মানবিক পরিস্থিতি সংকটের মুখে পড়েছে। নির্যাতনের মুখে দেশান্তরী হওয়া রোহিঙ্গাদের

আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের এ সহযোগিতা প্রশংসার দাবি রাখে এ মন্তব্য করে ইউএনএইচসিআর'র এই কর্মকর্তা বলেন, “এটা অনেক বড় সংখ্যা এবং বাংলাদেশের নিজের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে।” পরিস্থিতি বেশ জটিল মন্তব্য করে এর জন্য সমন্বিত পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি। ওকোথ-ওকোথ বলেন, এখনও অনেক কিছু করতে হবে। সব ধরনের প্রয়োজনের দিকে নজর দিয়ে আমাদের কার্যক্রম বাড়াতে হবে। রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এতে সহায়তার প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, “এটা নিয়ে আমরা খুব আনন্দিত। শরণার্থীদের প্রকৃত সংখ্যা বের করা এবং সংকট মোকাবেলায় যথাযথ সাড়া প্রদানের জন্য তাদের তথ্য লিপিবদ্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ।” চার লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর মধ্যে ৬০ শতাংশই শিশু।

দায় আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠীর

রোহিঙ্গা যে আমাদের জন্য মিয়ানমারের চাপিয়ে দেওয়া একটি বড় বিপদ, সে বিষয়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনো সচেতন নয়। অধিকাংশ লোকই একে দেখছে একটি সাময়িক বিপর্যয় ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হিসেবে। কিন্তু রোহিঙ্গা সমস্যা কোন সাময়িক বিপর্যয় নয়, দীর্ঘ কয়েক যুগের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলে আসা এথনিক ক্লিনজিং। এর পিছনে আছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সূক্ষ্ম রাজনৈতিক কূটকৌশল। মিয়ানমার সরকার চায় এই প্রায় ২০ লাখ রোহিঙ্গার দায় সব সময়ের জন্য বাংলাদেশের কাঁধে চাপিয়ে দিতে। মিয়ানমারের সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়ই প্রকাশ্যে এই রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি হিসেবে আখ্যায়িত করে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। তাই এ বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক অবস্থানে থাকতে হবে। শুধু ভাষা, ধর্ম কিংবা নৃতাত্ত্বিক গঠনে সাদৃশ্য থাকার কারণেই মিয়ানমারের ২৫ লাখ লোকের দায় বাংলাদেশ নিতে পারে না। ইতিমধ্যে যে বিপুল পরিমাণ রোহিঙ্গা এ দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তাদেরও ফেরত দানের ব্যাপারে বাংলাদেশকে বড় আকারে উদ্যোগ নিতে হবে। মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্কে যদি এদের ফেরত দেওয়া না যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ নিয়ে

কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো প্রয়োজন। মিয়ানমার এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন বৌদ্ধ দেশ নয়। গণতন্ত্রের পথে দেশটি এক পা-দুই পা করে অগ্রসর হচ্ছে। নিজেদের সভ্যদেশ হিসেবে প্রমাণ করতে হলে মিয়ানমারের উচিত দ্রুত রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করা। একটি দেশের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করে আসা বড় একটি জনগোষ্ঠী নাগরিকত্ববিহীন থাকতে পারে না। পৃথিবীর সব মানুষেরই একটি দেশ পাওয়া জন্মগত অধিকার, মিয়ানমারের সেনা শাসকরা গায়ের জোরে সেই অধিকার অস্বীকার করবেন, সেটি চলতে পারে না। রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব যদি দেওয়া না যায়, তাহলে আগামী দিনের ইতিহাসে একালের বিশ্ব নেতৃত্বকে প্রশ্নের মুখেই পড়তে হবে।

বাংলাদেশের মানবিকতার প্রশংসা বিশ্বজুড়ে

মিয়ানমারে ২৫ আগস্ট সর্বশেষ সহিংসতা শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আনুমানিক চার লাখ রোহিঙ্গা তাদের বাড়িঘর থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে জানিয়েছে ইউনাইটেড ন্যাশনস চিলড্রেন ফান্ড (ইউনিসেফ)। সংস্থাটি বলছে, এর মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই শিশু। সম্প্রতি কক্সবাজার থেকে ইউনিসেফের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘২৫ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত চার লাখের মতো রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। এখনো প্রতিদিন হাজার হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে।’ বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই শিশু। আগে থেকে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থী শিবিরগুলোতে নতুন করে আসা এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা যেখানেই জায়গা পাচ্ছে সেখানেই আশ্রয় নিচ্ছে। শিশুদের নিরাপত্তা ও শরণার্থীদের আশ্রয় দানের বিষয়ে বাংলাদেশে মানবিকতা বিশ্বমহলে ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা মুসলমানদের যা যা করণীয়

■ রোহিঙ্গা জাতিকে একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করে, তার অধীনে একতা বদ্ধ থাকা। ■ সেই কার্যকরী পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোহিঙ্গাদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা। ■ সকল রোহিঙ্গার একটি ডাটাবেইস তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ। ■ রোহিঙ্গাদের ধর্মীয়-জাতীয় শিক্ষা ও প্রাথমিক চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে ও তার ব্যবস্থাপনায় জাতিসংঘের সাথে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। ■ রোহিঙ্গা মুসলমানদের ঈমানী মেহনত ও দাওয়াতি কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা। ■ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা। ■ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মাঝে চেতনা ছড়িয়ে দেওয়া। ■ সন্ত্রাসবাদ যাতে প্রসার লাভ না করতে পারে, তার জন্য কর্মসূচী হাতে নেয়া। ■ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আদালতে মায়ানমার সরকারের বিরুদ্ধে প্রমাণসহ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ। ■ বিশ্বে জনমত সৃষ্টির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা ও কর্মসূচী হাতে নেয়া। ■ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলোকে প্রভাবিত করা যাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠনগুলো মিয়ানমার সরকারকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে চাপ সৃষ্টি করে। ■ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মিয়ানমার যাতে বাধ্য হয়, সেজন্য প্রচলিত বৈধ পন্থায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে সামরিক-বেসামরিক আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া।

বাংলাদেশের যা যা করণীয় হতে পারে

■ নিয়মতান্ত্রিকভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাময়িক সময়ের জন্য রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেয়া। ঢালাওভাবে সবসময় শরণার্থী প্রবেশের জন্য সীমান্ত খুলে না দেওয়া, কারণ মনে রাখতে হবে সীমান্ত খুলে দেওয়াই রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান নয়। ■ যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আছে, তাদের তালিকা তৈরি করা, নিরাপত্তা প্রদান, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মানসম্মত ব্যবস্থা করা। ■ রোহিঙ্গা শরণার্থী নীতিমালা প্রণয়ন করা; যার মাধ্যমে উদ্বাস্তু রোহিঙ্গাদের কি কি সুবিধা

বাংলাদেশ সরকার প্রদান করবে এবং রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে থাকতে হলে কি কি বিধিমালা মেনে চলতে হবে সেখানে তার উল্লেখ থাকবে। ■ যেসব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আছে, তাদের পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও সংগঠনের সহায়তায় মিয়ানমারে নিজ আবাসভূমিতে স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা করা। এছাড়া রোহিঙ্গা রিফিউজিদের তৃতীয় কোন দেশে প্রেরণের বিষয়ে চেষ্টা করা। যাতে তারা আরও ভালো উন্নত জীবন যাবন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে তুরস্কসহ আরব বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। ■ আন্তর্জাতিক ও স্থানীয়ভাবে মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে এবং আরাকানের উত্তরাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন দেয়া বা তাদের স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা। ■ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেউ যেন ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে। সে দিকে সর্বদা সতর্ক থাকা। ■ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক সময়ের জন্য হলেও বুঝা মনে না করে তাদের অবস্থানস্থলে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যা যা করণীয় হতে পারে

■ আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর মায়ানমারের সরকার ও মগদের হামলা বন্ধ করার স্থায়ী উদ্যোগ নিতে হবে। ■ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করা। ■ মিয়ানমারের উপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে করে, মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নাগরিকত্ব প্রদান করে। ■ আরাকানের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বা স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা। ■ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের পূর্ণ নিরাপত্তার মাধ্যমে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা। ■ জাতিসংঘের স্থায়ী শান্তি মিশন প্রেরণ করা। ■ রোহিঙ্গাদের জন্য পূর্ণ পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেয়া। ■ মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের উপর হামলা বন্ধ না করলে, আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক অবরোধ তৈরি করা।

মিয়ানমারের যা যা করণীয় হতে পারে

■ ঐতিহাসিকভাবে এটা প্রমাণিত যে, রোহিঙ্গারা আরাকানের স্থায়ী আদি অধিবাসী। তাই, মিয়ানমার সরকারের উচিত রোহিঙ্গাদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকত্ব প্রদান করা। ■ রোহিঙ্গাদের জন্য কমপক্ষে পঁচিশ বর্ষব্যাপী উন্নয়ণ পরিকল্পনা গ্রহণ। ■ যেহেতু চলমান সংকট মিয়ানমার সরকারের সৃষ্টি, তাই সমাধান যেকোন উপায়ে তাদেরকেই করতে হবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে রোহিঙ্গাদের জন্য যে গ্যাটোগুলো আছে, সেগুলোর অবসান ঘটিয়ে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসন দেয়া। ■ বাংলাদেশে যেসকল রোহিঙ্গা উদ্ধাস্ত আছে, তাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসন দেয়া। ■ রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঠেকাতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়া। ■ আরাকানের উত্তরাঞ্চলে রোহিঙ্গাদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র বা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের ব্যবস্থা করা।

রোহিঙ্গাদের দেখে আপ্তত সাংবাদিকরাও

ভিটে মাটি ছেড়ে মাইন পোতা বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে ছুটছেন তারা। কেউ নেই পাশে। সেনা নির্যাতনের মুখে কোলের শিশু সন্তানটিকেও ফেলে আসতে হয়েছে কারো। কেউ বা কবর দিয়ে এসেছেন শিশু-স্বামী কিংবা রক্তের স্বজন। কেউ আবার সে সুযোগটুকুও পায়নি। দরিদ্র-দুর্বল যে নারী তার নিজের শরীরটাকেই টেনে আনতে কষ্ট হয় এই দুর্গম পথ ধরে সে ক্ষুধার্ত পেটে কাঁধে তুলে নিয়েছেন ২/৩ জন শিশুকে। তাকে হেঁটে বেড়াতে হচ্ছে মাইলের পর মাইল, দিনের পর দিন। গণমাধ্যম জুড়ে এখন কেবলই এমন সংবাদের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সংবাদ কর্মীরা নিজেরাও ভুগছেন বিষন্নতায়। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে নিজেদের অনুভূতি জানাতে গিয়ে অনেকেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজ চোখে দেখা রোহিঙ্গাদের শরণার্থী জীবনকে অমানবিক বলে বর্ণনা করছেন তারা। ছবি তুলতে গিয়ে কেঁপে উঠছে মানবিক হৃদয়। ক্ষুধার্ত শিশুদের যে চাহনি আহাজারি, সন্তান হারা মায়ের কান্না, স্বজনের লাশ ফেলে ছুটে আসা মানুষগুলো বর্ডার পার হতে

পারলেই নাম হয়ে যায় শরণার্থী। আর যারা পারেনা তারা থাকে বাঙ্গালী সন্তাসী উপাধি নিয়ে সেনা নির্যাতনের মুখে। ঝড়-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অমানবিক জীবন যাপনের কথা বর্ণনা করছেন এইসব সাংবাদিকরা। রোহিঙ্গাদের প্রিয় ভিটেমাটি স্বজন পরিচয় সব কিছু ফিকে হয়ে যায় এইসব সীমান্তের বেড়াজালে এসে। জাতীয়তা, ভূমি প্রেম, সংসার সীমান্তের ওই পারে রেখে এসে তারা এখন শরণার্থী। বাংলাদেশ সীমান্তে আশ্রয় নিতে পারলেও বেঁচে থাকা এখন কষ্টকর হয়ে উঠছে। এতো মানুষের জন্য খাদ্য চিকিৎসা বাসস্থান ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলোও হিমশিম খাচ্ছে। এদিকে রবিবার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার মিয়ানমার সীমান্ত সংলগ্ন রেজু আমতলি ও তুমব্রু সীমান্তে মাইন বিস্ফোরণে ৩ রাখাইন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ৭১ টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার হোসাইন সোহেল বলেন, “লক্ষাধিক শিশু খোলা আকাশের নিচে। এমন দৃশ্য দেখে ঠিক থাকা যায় না। ঢাকায় বসে গরম চায়ের পেয়ালা মুখে মানবিক এসব দৃশ্যের যোগ বিয়োগের হিসেব মিলানো সহসা কারও ভুল হতে পারে। এ পর্যন্ত পাঁচ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার প্রবেশ ঘটেছে যার মধ্যে শিশুদের সংখ্যাটা বেশি। তবে কতো তা এখনও জানা যায়নি।” ফটো সাংবাদিক সৈয়দ জাকির হোসেন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ছবি তুলতে গিয়ে বিবিসিকে জানিয়েছেন “স্বাভাবিকভাবেই তারা বাকরুদ্ধ। তারা ওভাবে বলতেও পারে না। বাচ্চাকে ফেলে রেখে চলে এসেছে মা, সেই মা কিভাবে তার মনোভাব প্রকাশ করবে। সত্যিকার অর্থে এটা একটা প্রচণ্ড মানবিক বিপর্যয় যাকে বলে আর কি। তাদের যে অসহায়ত্ব সেটা এতো স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে কষ্ট লাগে।” এই দৃদশার মধ্যেই বৃষ্টি ডেকে এনে আরেক দূর্যোগ। বৃষ্টি মাথায় করেই ভিজতে ভিজতে মাইলের পর মাইল মায়ের হাত ধরে হাটছে শিশুরা। সীমান্তে পার হওয়া মানুষগুলোর মুখ থেকে এই সব দৃদশার করুন গল্প শুনতে গিয়ে অনেকেই এর ভয়াবহতা আতকে ওঠেন। আর আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা যখন বর্ণনা করে তাদের লোমহর্ষক নির্যাতনের খবর তখন অনেকেই শিউরে ওঠেন। বাংলা ট্রিবিউনের সাংবাদিক আমানুর রহমান ঘটনা বেশ কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে জানালেন,

সংবাদ সংগ্রহে এসে তিনি দেখেছেন এখানকার মানুষ কতটা অমানবিক জীবন যাপন করছে। তিনি বলেন, “ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে অনেকেই রাস্তায়, জঙ্গলে খোলা আকাশের নিচে। এ এক অমানবিক দৃশ্য। নারী শিশুরা ভিজছে। ভ্রাণ সহায়তা আসলেও তা পর্যাণ্ট না। মানুষ হিসেবে মানুষের এমন কষ্ট দেখাটা সত্যিই যন্ত্রনার।” সদ্য জন্ম দেয়া এক নবজাতকের মায়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, গর্ভে সন্তান নিয়ে ১৩ দিন পায়ে হেটে তিনি সীমান্তে পারি দিয়ে কক্সবাজারের উখিয়া পৌঁছেছেন। ভাবতে পারেন কি করুন অবস্থা। অবশেষে সেই শিশুটির জন্ম হয়। তবে জীবনের যন্ত্রণায় দুই দিনেও নাম রাখেননি মা। সেই ভাবনার সুযোগ তার হয়নি! আমানুর রহমান শরণার্থী ক্যাম্পে থাকা সেই শিশুটির নাম রেখেছেন আয়েশা সিদ্দিকা। মার্কিন গণমাধ্যম পিবিসি নিউজ আওয়ার এর সাংবাদিক তানিয়া রশিদ বর্তমানে বাংলাদেশে আছেন সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তিনি বাংলাদেশ মায়ানমার সীমান্তে ঘুরে ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করছেন। তানিয়া রশিদ লিখেছেন, “মিয়ানমার থেকে হাজার হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী জীবন বাঁচাতে পায়ে হেঁটে পালিয়ে আসছে। কেউ কেউ হেঁটেছে টানা ১৫ দিন। বাংলাদেশ এসব শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সব মিলে টেকনাফে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে পর্যাপ্ত খাবার, পানি এমনকি থাকার ব্যবস্থাও নেই। নিবন্ধিত ক্যাম্পগুলো অনেক আগেই শরণার্থী দিয়ে ভরে গেছে। কেউ কেউ কোনরকম অস্থায়ী থাকার জায়গা করতে পারলেও বেশিরভাগ রোহিঙ্গা শরণার্থীকেই ঘুমাতে হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। তীব্র বৃষ্টিতেও মিলছে না তাদের মাথা গোজার ঠাঁই। তারা প্রচণ্ড দুর্বল, ক্ষুধার্ত এবং ক্লান্ত সাহায্য সংস্থাগুলো বলছে তাদের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন।”- অনলাইন থেকে নেয়া।

রোহিঙ্গা গ্রামে গিয়ে যা দেখলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক

ব্রিটিশ সাংবাদিক জনাথন হেড সম্প্রতি মিয়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে সাংবাদিকদের একটি দলের সঙ্গে রাখাইন রাজ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন। সাংবাদিকদের এই দলে অংশগ্রহণের শর্ত ছিল, সবাইকে একসঙ্গে থাকতে হবে। স্বাধীনভাবে কোথাও চলাফেরা করা যাবে না।

সরকারের নির্ধারণ করে দেওয়া জায়গাগুলোতেই শুধু তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেটাই করা হয়েছে। সরকার নিয়ন্ত্রিত পরিদর্শনের মাঝেও রোহিঙ্গা মুসলিম নিধনের এক ভয়াবহ চিত্র ওই সাংবাদিকের চোখে পড়েছে। নিজের দেখা রোহিঙ্গা গ্রাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, গ্রামটিতে ঢুকে প্রথম বাড়িতেই আগুনের চিহ্ন দেখা গেল। আগুন দেওয়া হয়েছে আরও অনেক বাড়িতে। মনে হলো, কিছুক্ষণ আগেই এই আগুন দেওয়া হয়েছে। একদল তরুণকে তলোয়ার ও দিয়াশলাই হাতে নিয়ে ঘুরতে দেখা গেল। চোখে পড়ল গ্রামের রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গৃহস্থালি পণ্য, শিশুদের খেলনা ও নারীদের পোশাক। জনাথন হেড বলেছেন, তিনি একটি রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়ে যেতে দেখেছেন। রাখাইনের মংগদু জেলায় আল লে থান কিয়া শহর পরিদর্শন শেষে ফিরে আসার সময় কিছু পুড়িয়ে দেওয়া বাড়িঘর তাঁর নজরে আসে। তখনও সেখান থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের বলা হয়, রোহিঙ্গা মুসলিমরা নিজেরাই নিজেদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। জনাথন বলেন, ‘সেখানে থাকতেই আমরা স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির শব্দ শুনতে পাই। অন্তত তিনটি স্থান থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখি।’ জনাথন বলেন, ‘আমাদের পেছনে বনের পাশে ধানখেত থেকে বড় ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। সেটি স্বাভাবিকভাবেই মনে হচ্ছিল একটি গ্রাম। বিষয়টি জানার জন্য আমরা সেখানে ফিরে যাই। পৌছানোর পর গ্রামের প্রথম বাড়িতেই আগুনের চিহ্ন দেখতে পাই। চিহ্ন দেখে স্পষ্ট মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই সেখানে আগুন লাগানো হয়েছে।’ জনগণের বর্ণনায়, ‘গ্রামটিতে যখন হাঁটছিলাম তখন তরুণদের একটি দল চোখে পড়ে। তাদের হাতে দিয়াশলাই ও তলোয়ার ছিল। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করলেও তারা রাজি হয়নি। তাদের ছবিও তুলতে দেয়নি। আমাদের মিয়ানমারের সহকর্মীরা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তরুণদের একজন স্বীকার করেন, তিনি রোহিঙ্গাদের বাড়িঘরে আগুন দিয়েছেন। এ জন্য তিনি পুলিশের কাছ থেকে সহযোগিতা পেয়েছেন। [বিবিসি]

শরণার্থীদের কান্না

বর্তমানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর তরুণ-যুবক, যুবতী-নারী ও শিশুদের নির্বিশেষে হত্যা করছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বর্বর মগ সন্ত্রাসীরা। এছাড়া নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর গত ক'দিনে রোহিঙ্গা পরিবারে ছেলে শিশু জন্মের খবর পেলে তাদের কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে হত্যা করছে সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর মগ ও মুরংরা এমন খবর শরণার্থীদের মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের লক্ষ্য মিয়ানমারের রোহিঙ্গা প্রজন্মকে জাতিগতভাবে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা। এমন নির্মমতার মুখে ঝোপঝাড় লুকিয়ে ভিটেমাটি ধরে রাখার শেষ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে দেশ ছাড়তে শুরু করে নিরীহ রোহিঙ্গারা। রাখাইন রাজ্যের একাধিক রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ ও যুবকের সঙ্গে বাংলাদেশের গণমাধ্যম কর্মীরা আলাপ করলে এসব তথ্য সম্পর্কে জানা যায় বাড়িঘর পোড়ানোর পরও বাংলাদেশে পালিয়ে না আসাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে নারী ও বৃদ্ধদের গুলি অথবা গলা কেটে হত্যা করছে। তরুণ-যুবক ও যুবতী-নারীদের দেখলেই সেনাবাহিনী গুলি চালাচ্ছে। মগ-মুরংরা ধরে নিয়ে গলা কেটে হত্যা করছে। সদ্যোজাত ছেলে শিশু পেলে ছুড়ে ফেলে হত্যার পর বিকৃত উল্লাস করছে। শরণার্থীদের মুখ থেকে মিডিয়ায় উঠে আসা এমনই কিছু নির্মম ঘটনা প্রবাহ পাঠকের জন্য তুলে ধরা হলো।

অশ্রুর কাছে হেরে কষ্টের লোনা জল

আমার দুহাতের মুঠোয় কান্নার ফোঁটাগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই। শব্দ-বাক্য নেই। চিত্র নির্মানের মাধুর্য নেই; আছে এক অব্যক্ত বোধ ও উপলব্ধি। ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থী একজন হাফেজ আহমদ যখন তার জীবনের নির্মম কষ্টের গল্পটি বলছিলেন তখন আমি উপলব্ধি করে করে শিউড়ে উঠেছি। কিন্তু তা যথাযথ ব্যক্ত করার মত ভাষা আমার নেই। আমি দুঃখিত। আমি এখানে শুধু তার দেওয়া তথ্যগুলো তথ্য আকারে তুলে দিচ্ছি। জীবন-পোড়ানো এ গল্পগুলো যেমন-তেমনভাবে হলেও লিপিবদ্ধ থাকুক।

পঞ্চাশের কোঠা পেরোনো হাফেজ আহমদের ছিলো সাজানো গোছানো সুন্দর একটি পরিবার। আপন ভাই দিল মুহাম্মদ আর তিনি বাস করতেন বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে আরাকানের এক নিভৃত পল্লীতে। বিশাল এলাকাজুড়ে ছিলো তার চাষাবাদ আর মাছের খামার। বাবা ইন্তেকাল করেছেন বেশ আগেই। মা নূর বাহার এখনো জীবিত। স্ত্রী তৈয়বা খাতুন আর ছয় সন্তানে সমৃদ্ধ সুখের সংসারটিতে মগ দস্যুরা হানা দিয়ে তছনছ করে দেয়। কয়েক বছর আগে তাঁর বড় ছেলে ২১/২২ বছরের তরতাজা যুবক মুহাম্মদ আশিককে ওরা হত্যা করে নির্মমভাবে। হত্যা করে তার দ্বিতীয় সন্তান আনোয়ারা বেগমের স্বামী ইসমাঈলকে। আনোয়ারার বয়স তখন মাত্র বিশের ঘর পেরিয়েছে। যুবক ইসমাঈলের ছিলো বিশাল কাপড়ের দোকান। তাদের একটি মাত্র ছেলে আকীকুর রহমানকে নিয়ে তারা যখন স্বপ্নপথে যাত্রা করছে তখনই নেমে আসে মগ দস্যুদের নির্মম নির্যাতনের আঘাত। এরপর থেকে আনোয়ারা তার ছেলে আকীকুর রহমানকে নিয়ে পিতা হাফেজ আহমদের সাথেই বসবাস করছিলেন। ২৬ বছরের তরুণী আনোয়ারা এখন অনিরাপদ সংকীর্ণ এক পৃথিবীর পথে পথে ঘুরে বেড়ান, আর একটি মাত্র ছেলেকে বুকে চেপে ধরে চোখের জলে রাত ভাসান। বাকি সন্তানেরা হলেন মুহাম্মদ সুলেমান (১৬), সেনোওয়ারা বেগম (৭), খুরশিদা বেগম (৫) নূর হুসেন (৩)।

হাফেজ আহমদ বলেন-

জানেন! আমার কোন অভাব ছিলো না। জমি ছিলো মোট ১৬ ধুন। আপনারা কী বলেন জানি না। আমরা বলি ধুন। আমার অনেকগুলো গরু ছিলো। চিংড়ি ঘের ছিলো মোট সাতটি। আমি যখন পালিয়ে আসি তখনও তিনটিতে মাছ ছিলো। আমার মাছ বাংলাদেশেও রপ্তানি হতো। ধান, মরিচ, তরি-তরকারি আর মাছ ফলিয়ে খুব স্বাচ্ছন্দেই চলছিলাম। কিন্তু আমাদের মনে শান্তি ছিলো না। কখন কোনদিকে ওরা আসে বলা যায় না। আমার বড় ছেলেটাকে, আমার বড় মেয়ের স্বামীটিকে ওরা কয়েক বছর আগে নির্মমভাবে মেরে ফেলে। এই ছয় মাস আগে যখন ওরা আমার বাড়িতে আগুন দেয় তখন আমি বাড়ি থেকে আধা কিলোমিটার দূরে এক দোকানে বসা ছিলাম। আমি তো বিশ্বাসই করি নি। জান হাতে নিয়ে

দৌড়ে এলাম। এসে দেখি আমার ঘর জ্বলছে। ঘরের লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দিক-বেদিক ছোটোছুটি করছে আর এলোপাতাড়ি আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। বৌদ্ধ দস্যুরা তখন কী করছিলেন? ওদের সবার হাতে ছিলো রামদা-ছুরি আর দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র। ওরা আগুন ঘিরে উল্লাস করছিল। ওদের নেতাটি উঠোনে চেয়ার পেতে বসে ছিলো। আমি গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে আমার মাকে কুলে নিলাম। আর ডাকা-ডাকি করে উপস্থিত অন্য সবাইকে নিয়ে নিজের নৌকায় উঠে দ্রুত নৌকা ভাসিয়ে দিই। হাফেজ আহমদ সে-সময় সাথে কিছুই আনতে পারেন নি। ব্যাংক সুবিধা না থাকায় টাকা-পয়সা ঘরেই থাকতো। অনেক টাকা জমেছিলো। ৪ ভরি স্বর্ণ ছিলো। সব ফেলে এসেছেন। এমনকি সামান্য কিছু খাবার-দাবারও আনতে পারেন নি।

তিনি বলেন- আমার তখন টার্গেট ছিলো- যেভাবেই হোক আমার মাকে বাঁচাতে হবে। পরিবারের লোকদেরকে বাঁচাতে হবে। আমি শুধু তাদের প্রতিই লক্ষ্য করেছি। ওরা না থাকলে টাকা-পয়সা দিয়ে আমার কী হবে? আমরা যখন রওয়ানা করি তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আবছা অন্ধকারে নৌকায় ভাসি। জানি না সামনে কী আছে। সীমান্তে আসি এশা নামায়ের সময়। কিন্তু বিজিবি আমাদেরকে ঢুকতে দেয় নি। অনেক জায়গা দিয়ে চেষ্টা করলাম। সারা রাত পার হলো। এরপর আরো তিনদিন এখান থেকে ওখানে নৌকায় করে ঘুরে বেড়িয়েছি। এ তিনদিন আমাদের ভাগ্যে কোন খাবার জুটেনি। কাপড় ভিজিয়ে বাচ্চাদের মুখে নদীর লোনা পানি নিংড়ে দিয়েছি। তিনদিন পর রাত তিনটের দিকে শাহ পরীর দ্বীপে নৌকা ভিড়াই। বৃদ্ধ এক লোক আমাদেরকে তার উঠোনে আশ্রয় দেন। চিড়া খেতে দেন। ফ্যরের সময় আমাদেরকে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। নিরুদ্দেশ বেরিয়ে পড়ি। আমার মেয়ের আর স্ত্রীর আট হাজার টাকার নাক-ফুল বিক্রি করি মাত্র চার হাজার টাকায়। সে টাকা দিয়ে জীপে করে টেকনাফ। সেখান থেকে বাসযোগে কুতুবপালং। এখানে রাস্তার পাশে খেয়ে না খেয়ে ১১ দিন কাটাই। আজও খেয়ে না খেয়ে উদ্বল হয়ে পথে-পথেই আছি। অনুলিখন- সাবের চৌধুরী

‘ধর্ষণে বাধা দেওয়ায় সেনারা পিটিয়েছে’

‘বিশ্বের সবাইকে আমি আমাদের জায়গায় দাঁড় করাতে চাই, তোমরা যেমন মানুষ, আমরাও ঠিক একই মানুষ।’ বুকভরা ব্যথা নিয়ে এ কথা বলেছেন রাখাইন রাজ্য থেকে সম্প্রতি বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা আহসান। ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে সহিংসতা শুরু হওয়ার পর বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গারা নানান সমস্যার মধ্যে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাঁদেরই একজন ৩০ বছর বয়সী আহসান। রাখাইন রাজ্যের চীন খালি গ্রামে নিজ বাড়িতে চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় মাসহ পরিবারের পাঁচজনকে। নির্মম সেই ঘটনার বর্ণনা কল্পবাজারের কুতুপাংলয়ে তিনি শুনিয়েছেন কাতারভিত্তিক আল জাজিরার প্রতিবেদককে। সেই নৃশংসতা, এহসানের বেঁচে যাওয়া, রোহিঙ্গা অধিকার নিয়ে তাঁর কথা ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে তুলে ধরা হলো: আহসান বলেন, ‘মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতা শুরু হওয়ার আগে নিজ জমিতে কৃষিকাজ করতাম। কাজ শেষে ছেলে-মেয়েকে পড়াতাম। সব মিলিয়ে আমার ব্যস্ত সময় কাটত। নৃশংসতা শুরু গত ২৫ আগস্ট সকালে। প্রতিদিনের মতো পরিবারের সবাই আমরা একসঙ্গে খাচ্ছিলাম। ওই সময় মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়ে। অতর্কিত গুলি ছুড়তে শুরু করে। তাদের নির্বিচার গুলিতে আমাদের পরিবারের পাঁচ সদস্য প্রাণ হারায়।’ তিনি বলেন, ‘আমি দেখলাম, পিঠে গুলি লেগে মা মাটিতে পড়ে আছেন। মুখ ও শরীরে অনেক ছুরিকাঘাত খাওয়া আমার বোন পড়ে ছিল মায়ের পাশেই। এ ভয়ংকর দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। তাঁদের এ অবস্থা দেখে যে একটু কাঁদবে, সেই সামান্য সুযোগটুকুও পাইনি। কারণ সামরিক বাহিনীর গুলি থেকে বাঁচতে পালাতে হয়েছে।’ নিজের বোনের সেই ধর্ষণের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে আহসান বলেন, একজন সেনাসদস্য বোনকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে তিনি বাধা দেন। এ সময় তাঁকে পিটিয়েছে সেনারা। তিনি বলেন, ‘এরপর থেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বোনটি কথা বলে না, কোনো রকমে একটু-আধটু চলতে পারে। বাঁশ ও কম্বলের সাহায্য আমি আর আমার ভাই বোনকে বাংলাদেশে বহন করে এনেছি।’ বাংলাদেশে আসার কথা বর্ণনা করে

আহসান বলেন, ‘বাংলাদেশে আসার পথে আমরা আরও ভয়ংকর দৃশ্য দেখেছি। পথে অসংখ্য মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। খেতে না পাওয়া শিশু ও বৃদ্ধের কান্না দেখেছি। যখন আমরা সীমান্তে পৌঁছলাম, দেখি হাজারের বেশি রোহিঙ্গা আমাদের মতো নদী পার হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন আমরা একটি নৌকা দেখতে পেলাম, যেটা সবাইকে পারাপারের কাজে ব্যবহার করছে।’ আহসান বলেন, ‘বাংলাদেশে আমরা খুব কষ্টে আছি। জীবন খুব অমানবিক ও নির্মম। আমাদের থাকার কোনো জায়গা নেই, প্রাকৃতিক কাজ সারারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ঘুমানোর জন্য পর্যাপ্ত জায়গাও নেই। আমরা বেঁচে আছি, কিন্তু এই বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এই বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। যাঁরা মিয়ানমারে আছেন, তাঁরা মারা যাবেন। কিন্তু এখানেও আমাদের জীবন বলে কিছু নেই।’ আহসান বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, পুরো বিশ্ব আমাদের সাহায্য করছে এবং সমর্থন করছে। এজন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। আপনারা যেভাবে বেঁচে আছেন, আমরাও ঠিক সেভাবেই বাঁচতে চাই।’

সব হারানো দুই শিশু

একটি খাবার হোটেলের সামনে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে আছে দুটি শিশু। দৃষ্টি হোটেলের ভেতরে। কাছে গিয়ে জানা গেল, তারা দুই ভাই। মোহাইয়ের বয়স ১২ বছর ও ইয়াজের ৮ বছর। চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা ক্ষুধার্ত। যে হোটেলের সামনে তারা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটি টেকনাফ শহরের উত্তরে পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়ের কাছে অবস্থিত। হোটেলটির কোনো নাম বা সাইনবোর্ড নেই। তবে এর খাবারের খ্যাতি স্থানীয় সবার মুখে মুখে। তাই ভিড় লেগেই থাকে। কিন্তু ক্ষুধার্ত হলেও শিশু দুটি সেই খাবারের স্বাদ নিতে পারছে না। কারণ, খাবার কেনার টাকা নেই। কারও কাছে চাইবে, সেই সাহসও পাচ্ছে না। কিংবা অভ্যস্ত নয় বলে ইতস্তত করছিল। টেকনাফ শহরে এমন দৃশ্য এখন স্থানীয় লোকজনের চোখ সওয়া। অনেক রোহিঙ্গা শিশু-কিশোর এখন টেকনাফের পথে পথে ঘুরছে। খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে। মোহাই ও

ইয়াজও যে রোহিঙ্গা। মোহাই ও ইয়াজের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলে কৌতূহলী অনেকে এগিয়ে এলেন। তাঁরা সাহায্যও করলেন ওদের আরাকানি বাংলা, প্রমিত বাংলায় অনুবাদ করে দিতে। তাতে জানা গেল, এই দুই ভাই সকালেই নৌকায় করে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের মংগদু থেকে শাহপরীর দ্বীপে এসে নেমেছে। তারপর সেখান থেকে ট্রাকে করে এসেছে টেকনাফ শহরে। স্থানীয় কিছু স্বেচ্ছাসেবক ছোট ছোট ট্রাকে করে বিনা ভাড়ায় এপারে আসা রোহিঙ্গাদের শাহপরীর দ্বীপ থেকে টেকনাফ শহরে আনার ব্যবস্থা করেছেন। নাফ নদী পার হতে নৌকা ভাড়া এখন কিছুটা কমেছে। তবু জনপ্রতি বাংলাদেশি মুদ্রায় দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা লাগছে। ওরা দুই ভাইও নাফ নদী পার হয়েছে, তবে বিনা ভাড়া। তাদের প্রতি এই সহানুভূতির কারণ, দুনিয়ায় ওদের আর কেউ নেই। নৌকায় তারা অন্যের মালামাল তুলে ও নামিয়ে দিয়েছে। মাঝিরা তাদের দুঃখের কথা শুনে ভাড়া নেননি। মংগদুর মংনিপড়া গ্রামের উত্তরপাড়ায় ছিল মোহাইদের বাড়ি। বাঁশ-কাঠের দেয়াল আর গোলপাতার ছাউনির ঘর। বাবা আইয়ুব উদ্দিন কৃষক। অল্প কিছু জমি ছিল। মূলত অন্যের জমিতেই দিনমজুরি করতেন। পরিবারে আর ছিলেন মা আঞ্জুমান আরা ও বড় বোন ১৬ বছরের শাহানাজ বেগম। ঘটনা ঘটেছিল ঈদের পরের দিন বিকেলে। বাড়ির পাশেই মাঠে প্রতিদিনের মতো তারা দুই ভাই খেলতে গিয়েছিল। বাড়িতে ছিলেন মা-বাবা আর বোন। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর লোকেরা আগুন লাগিয়ে দেয়। পুরো পাড়াটিই জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা। ওরা দুই ভাই অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে যায় পাহাড়ের জঙ্গলে। ছোট ভাইটির গলা জড়িয়ে মোহাইউদ্দিন যখন দুর্বিসহ দিনগুলোর কথা বলছিল, একটা পর্যায়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে ইয়াজউদ্দিন। সেই কান্না খানিক পরে সংক্রমিত হয় বড় ভাইয়ের চোখেও। সকালে শাহপরীর দ্বীপ থেকে রওনা দেওয়ার আগে লোকজনের দেওয়া এক প্যাকেট বিস্কুট খেয়েছিল দুই ভাই। তাদের কান্না, তাদের কষ্ট স্পর্শ করে গেল উপস্থিত অনেকেরই হৃদয়। তাঁরা ওদের ডাকলেন হোটেলের ভেতর। -প্রথম আলো

পাতা খেয়ে সাত দিন

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সচ্ছল সংসার ছিল রাশিদার। কিন্তু হঠাৎ নেমে আসে ভয়াবহ অন্ধকার। সেনাবাহিনীর গণহত্যা থেকে বাঁচতে তিন সন্তান নিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন তিনি। আশ্রয় নিয়েছেন কক্সবাজারের উখিয়ার শরণার্থী শিবিরে। সেখানেই আলজাজিরার প্রতিনিধি কেটি আর্নল্ডের কাছে তুলে ধরেছেন সহিংসতা আর ভয়াবহতার কথা-

‘রাশিদা আমার নাম, বয়স ২৫ বছর। আরাকানে সহিংসতার আগে আমার খুবই শান্তিপূর্ণ ও সাদাসিধে জীবন ছিল। কিছু চাষের জমি ছিল আমাদের। ছিল গবাদিপশু। সুন্দর একটি ঘর ছিল। স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে সেখানে বাস করতাম। এই সহিংসতার আগে সুখের সংসার ছিল আমার। কিন্তু সব কিছুই আমরা ফেলে এসেছি। আমাদের বাড়ি ও ফসলের ক্ষেত পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে জীবিকা নির্বাহের আর কোন পথ নেই। সেনাবাহিনী যখন আমাদের গ্রামে হামলা করল, দ্রুত তিন সন্তানকে নিয়ে জঙ্গলে লুকাই। জঙ্গলে খুবই ভয়ে ছিল বাচ্চারা।

কিছুক্ষণ পর ওদের জঙ্গলে রেখে বাড়ি গিয়ে দেখি, অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছে, তাদের লাশ পড়ে আছে। তারপর সেই জঙ্গল থেকেই বাচ্চাদের নিয়ে হাঁটা শুরু করি। সাত দিন পর এসে পৌঁছলাম বাংলাদেশ সীমান্তে। এ সময় খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম আমরা। গাছের পাতা ছাড়া খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। বাচ্চারা খাবার চেয়েছে। কিন্তু আমরা তো সাথে কিছুই আনতে পারিনি খাওয়ার মতো।

ছোট্ট একটি নৌকায় চড়ে সীমান্তের নদী পার হয়েছি আমরা, যা ছিল খুবই বিপজ্জনক। মনে হয়েছে এই বুঝি নৌকা ডুবে গেল। শিশুদের শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম দু’হাতে। বাংলাদেশে এসে আমি মোটেই খুশি নই। এক একর জমিতে ধান চাষ করতাম। নিজেদের গবাদিপশু ছিল। থাকার ঘর ছিল। তা ছাড়া, আমাদের গ্রামটি ছিল খুবই সুন্দর। এর সব কিছুই আমরা ফেলে এসেছি। কাজেই আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন, কতটা কষ্টে আছি আমরা।

বাড়ির কথা মনে পড়লে ভীষণ কষ্ট হয়। এখানে আমরা আশাহীনভাবে বেঁচে আছি। ভবিষ্যতে কী হবে, তা জানি না। পর্যাপ্ত সাহায্যও পাচ্ছি না।

বাংলাদেশীরা খুবই দয়ালু। তারা খাদ্য ও কাপড় দিয়ে আমাদের সহায়তা করছে। কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এখানে দেখছি না। আশা করি, তারা আমাদের সাহায্য করবে। আমাদের খাদ্য দরকার। বিশ্ববাসীর কাছে আমার আকুতি, আমরা শান্তি চাই। শান্তি ছাড়া আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।’ ভাষান্তর : আহমেদ বায়েজীদ

রক্ষা পায়নি ১৩ দিনের শিশুও

মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর বর্বর নির্যাতন থেকে রক্ষা পায়নি ১৩ দিনের শিশু ও নারী। গ্রামে এসে লুটপাট শেষে লোকজনকে না পেয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা। যাওয়ার সময় উঠানে রোদে শোয়া নবজাতক সাইফুল আরমানের দিকে ছুড়ে মারে আগুন। এতে তার বুক ও হাতের অনেক অংশ পুড়ে যায়।

শিশুর প্রতি এই বর্বরতার বর্ণনা দিয়েছেন রাখাইনের রাচিডং থেকে আসা শিশুটির বাবা সৈয়দ নুর। আরমান এখন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গতকাল ভোরে তাকে এ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

সৈয়দ নুর গণমাধ্যমকে বলেন, সকালে সেনাবাহিনীর লোকজন ও তাদের সহযোগী স্থানীয় মগদের আমাদের গ্রামের দিকে আসতে দেখি। তখন আমরা পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যাই। সে সময় ১৩ দিনের শিশু আরমানকে বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাকে উঠানে একটি পাটিতে রেখে যাই। মনে করেছিলাম, এত ছোট শিশু, তাকে আর কী করবে তারা। কিন্তু ঘরে আগুন দিয়ে যাওয়ার সময় একটি জ্বলন্ত কাঠ শিশুটির দিকে ছুড়ে মারে তারা। সেটি তার বুকোর ওপর পড়লে বুক ও হাত আগুনে পুড়ে যায়।

তিনি বলেন, আগুনে পুড়ে নিস্তেজ হয়ে যায় আরমান। কিন্তু প্রাণ থাকায় পরিবারের অন্যদের নিয়ে পালিয়ে আসার সময় তাকেও নিয়ে আসি। পথে ১০ দিন টানা হেঁটে উপকূলে হাজির হই। দীর্ঘপথ হাঁটতে হাঁটতে আর অনাহারে মায়ের বুকোও দুধ পাওয়া যাচ্ছিল না। পথে কোথাও বসে যে একটু পানি পান করব, সেই অবস্থাও ছিল না। তবু শিশুটিকে বুকোর ওম

দিয়ে রেখেছিলাম আমি ও আমার স্ত্রী। গত তের সেপ্টেম্বর সৈয়দ নূর টেকনাফে পৌঁছার পর তাদের চিকিৎসার জন্য টেকনাফের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের হাসপাতালে আনা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য সেখান থেকে পাঠানো হয় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। [সূত্র: ইনসাফ ২৪ ডট কম]

কোটিপতি পরিবারটি পথের ফকির!

মিয়ানমারের টম বাজার এলাকায় খালেদা বেগম ছিলেন এক বিত্তশালী পরিবারের সদস্য। মুসলিম অধ্যুষিত ওই বাজারে তারাই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী। তাদের হার্ডওয়্যার, মুদির দোকানসহ বেশ কিছু দোকান ছিল, যা অন্তত কোটি টাকা মূল্যের। বাড়িও ছিল ওই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন। কিন্তু কোটিপতি থেকে মুহূর্তেই হয়ে গেলেন পথের ফকির। রাখাইনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের মুখে সব দোকান, বাড়িসহ সহায় সম্পত্তি ফেলে চলে আসেন বাংলাদেশে। ১৫ দিনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অনেক কষ্টে নাফ নদ ও কাঁটাতারের সীমারেখা পার হতে হয় তাদের। তবে তারা আসার পরপরই জানতে পেরেছেন, দোকান পাট ও বাড়িঘর জালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত দুই দিন হলো লাম্বাবিল হয়ে কুতুপালং এসে তার আশ্রয় জুটেছে খোলা আকাশের নিচে। এখনো কোনো তাঁবু পাননি। মেলেনি কোনো ত্রাণও। কুতুপালং সড়কের কাছে একটি নালার কিনারে কচু বাগানে বসে থাকতে দেখা যায় তাকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন অজানা, অচেনা পথের দিকে। সবকিছুই তার কাছে অপরিচিত। তার কোলজুড়ে ৩ মাসের একটি বাচ্চাকেও কান্না করতে দেখা যায়। যখন খালেদা বেগমের সঙ্গে কথা হয় তখন তিনি ছিলেন ক্ষুধার্ত। কিন্তু চেহারায় ছিল আভিজাত্যের ছাপ। ডান হাতে ছিল একটি গোল্ডেন রঙের ঘড়ি। পরনের পোশাকও ছিল অনেকটা মার্জিত। কিন্তু লজ্জায় ত্রাণের জন্য হাত পাততে পারছিলেন না। তিনি জানান, বাংলাদেশে আসার পথে দুই লাখ মিয়ানমারের মুদ্রা কিয়াট নিয়ে আসলেও দালালদের খপ্পরে পড়ে আড়াই হাজার টাকায় তা বিক্রি করে দেন। গত দুই দিন কষ্ট করে এই টাকা দিয়ে পানি আর শুকনো কিছু খাবার কিনে

বাচ্চাদের কোনোমতে খাওয়ান। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরাও না খেয়ে পথেই বসে রয়েছেন। খালেদা খানম বলেন, টম বাজার এলাকায় তারা ছিলেন রাজার হালে। কোনো কিছুই অভাব ছিল না। তাদের প্রায় ১২ একর জমি ছিল। ত্রিশটির মতো গরু ছিল। দোকান পাট ছাড়াও আরও কিছু সম্পদ ছিল। সব মিলিয়ে হবে কোটি টাকার। এখন কার কাছে যাব, কি করব কিছুই দিশা পাচ্ছেন না তিনি। যৌথ পরিবারের সদস্য আলেয়া বেগমের কোলেও দেখা যায় এক ছোট্ট শিশু। তিনি জানান, তার হাতে খাবার জন্য একটি টাকাও নেই। এখন চেয়ে খেতে হবে। এই বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। ওই পরিবারের পুরুষ সদস্য আবদুল হামিদ ও মৌলভি মাইনুদ্দিন জানান, তাদের পরিবারটি অনেক বড়। ত্রিশ সদস্যের সবাই বাংলাদেশে কষ্ট করে আসতে পারলেও সব সহায় সম্পত্তি ফেলে আসতে হয়েছে। এখন তারা শূন্য হাতে। সূত্র : 'বিডি প্রতিদিন নিউজ

‘নূর কাজল’ রোহিঙ্গা বলছি

‘আমার বাবা আমাকে কোলে নেয়। এমন সময় সেনারা বাইরে থেকে গুলি করে। জানলা দিয়ে গুলি এসে বাবার মাথায় লাগে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা ঘরের মেঝেতে পড়ে যান। আমি ভয়ে কাঁদছিলাম। বাবা তখনও ছটফট করছেন। তার মাথা থেকে প্রচুর রক্ত বের হচ্ছিল। তখন সেনারা আমাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে আমরা দৌড়ে পালালাম। সেনারা আমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিল। আমার বাবা ঘরের ভেতরেই ছিলেন। বাবাকে আর দেখতে পারিনি। পালিয়ে বাংলাদেশে চলে আসি।’ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের একজন নূর কাজল। ১০ বছরের শিশুটি এভাবে তার পরিবারের ওপর নির্যাতনের করুণ দৃশ্য বর্ণনা করছিল। কক্সবাজারের কুতুপালং শরণার্থী শিবির থেকে নূর কাজলের সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন আল জাজিরার সাংবাদিক কেটি আননন্দ। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া নূর কাজল আবার ফিরে যেতে চায় তার গ্রামে। যেখানে বাবাকে বুলেটের আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করা অবস্থায় রেখে এসেছিল নূর কাজল। নূর কাজল বলেন, ‘আমি বিশ্ববাসীর কাছে সাহায্য চাই। আমি আমার গ্রামে ফিরে যেতে

চাই। আমার গ্রামটি অনেক সুন্দর। আমি সেখানে একটি মাদরাসায় পড়তাম। মাদরাসায় আমি কোরআন শিখতাম। আমাদের ঘরটি বেশি বড় ছিল না। কিন্তু পরিবারের সাতজন মিলে আমরা খুব সুখেই ছিলাম।’

‘সেনাদের হামলার পর আমরা পালিয়ে আসি। আমরা জীবন বাঁচাতে দৌড়াতে থাকি। তিন দিন ধরে বন, বিল, খাল আর নদী পেরিয়ে আমরা বাংলাদেশে এসেছি। পথে আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল। কিন্তু কোনো খাবার ছিল না। এখন আমার বাবার কথা মনে পড়ছে।’ ‘আমাদের সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে আসতে অনেকে সাহায্য করেছিল। তারা খুব ভালো মানুষ ছিল। আমরা ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে নদী পার হচ্ছিলাম। কিন্তু আমি কোনো আনন্দ পাইনি। কারণ আমার বাবার কথা মনে পড়ছিল। এখনও আমার বাবাকে মনে পড়ছে।’

‘আমার বাবা একজন কার্টুরে ছিলেন। তিনি খুবই সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন। গ্রামের সবাই বাবাকে খুব ভালোবাসত। বাবাও আমাদের খুব ভালোবাসতেন।’ ‘আমি বাংলাদেশে এসেও খুব কষ্টে আছি। কারণ সবসময় আমার বাবাকে মনে পড়ে। এখানকার পরিবেশও ভালো না। বাথরুম বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও নেই।’ ‘এখন আমি আমার গ্রামে ফিরে যেতে চাই। এজন্য বিশ্ববাসীর কাছে আমি সাহায্য চাচ্ছি। আমাকে আমার গ্রামে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।’ সূত্র : যুগান্তর।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৭ রোহিঙ্গা শরণার্থী বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে তার প্রদত্ত ভাষণ একজন মানবিক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদী মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে। ভাষণের চুম্বক অংশ পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

আশ্রয় দিয়েছি মানবিক কারণে

সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দীর্ঘ ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন, রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন এমন পর্যায়ে এখন গেছে যে, যেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যখন মানুষ আসতে শুরু করেছে আমরা দেখেছি নারী, শিশুই বেশি। নৌকাডুবি হয়ে সেখানে শিশুর লাশ নাফ নদীতে ভাসছে। এমনকি গুলি খাওয়া, মাথায় এবং বুকে গুলি খাওয়া লাশ নদীতে অথবা সাগরে ভেসে ভেসে সেই লাশ চলে আসছে। সেখানে আগুন দিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। এই দৃশ্য দেখা যায় না! আমরা তো মানুষ! আমাদের ভেতরে তো একটা মনুষ্যত্ব আছে। তাদের আমরা নিষেধ করব কীভাবে? কারণ আমাদেরও তো অভিজ্ঞতা আছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঠিক যেভাবে, যে কায়দায় আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল অগ্নিসংযোগ করা, মেয়েদের ধর্ষণ করা, মানুষকে হত্যা করা এবং ছোট শিশুকে হত্যা করা ঠিক সেই ঘটনার সেই দৃশ্যগুলি যেন আবার চোখের সামনে ভেসে আসছে। আর এরা জীবনের ভয়ে পালিয়ে আসছে। আমাদের জন্য এটা কঠিন যে, এতগুলো মানুষকে এখানে রাখা, তাদের আশ্রয় দেওয়া। কিন্তু এরা তো মানবজাতি। আমরা তো ফেলে দিতে পারি না। কারণ আমরা ভুক্তভোগী, আমরা জানি। আমিও রিফিউজি ছিলাম ছয় বছর। ১৯৭৫এ যখন আমার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে হত্যা করল আমিও দেশে আসতে পারিনি। কাজেই রিফিউজি হয়ে থাকা সেটা যে কতটা অবমাননাকর এই যন্ত্রণা তো আমি আর আমার ছোট বোন রেহানা

খুব ভালোভাবে বুঝি। তাই আমরা এদের আশ্রয় দিয়েছি মানবিক কারণে। কিন্তু আমরা চাই তারা তাদের নিজের ভূমিতে যেন ফিরে যায়...।

মুসলিম বিশ্ব এক থাকলে তারা সাহস পেতনা

প্রধানমন্ত্রী সংসদে তার ভাষণে আরো বলেন, “আজকে সমস্ত বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে যখন দেখা যাচ্ছে যে, এভাবে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে। আমি ঠিক জানি না। বিশ্বব্যাপী আমি যদি তাকাই আমার খুব কষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করার একটা মানসিকতা দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানরা এসব রিফিউজি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে সেখানে। আমরা যেমন আইলানের লাশ দেখেছি সাগরপাড়ে ঠিক তেমনি নাফ নদীতে দেখি শিশুদের লাশ। কেন? আমাদের আর একটা দুর্ভাগ্য হল যে, আমাদের সমস্ত মুসলিম দেশগুলো বা মুসলিম উম্মাহ যদি এটা অনুভব করতে পারত আর সবাই যদি ঐক্যমত্যে থাকতে পারত, তাহলে মুসলমানদের উপর এই অত্যাচারটা কেউ করতে সাহস পারত না। আমি বারবার ওআইসির সেক্রেটারি জেনারেলকে বলেছি। যখন সম্মেলন হয়েছে তখনও বলেছি। আমি বিভিন্ন মুসলিম দেশের নেতাদের সঙ্গে যখন কথা বলেছি তখনও বলেছি যে, কোনো রকম সমস্যা থাকলে আমরা আলোচনা করি, আমরা সমাধান করি। কিন্তু আমরা অন্যের হাতের খেলার পুতুল কেন হব? কিন্তু দুর্ভাগ্য, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি বিশ্বব্যাপী এরকমই একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এখানে কে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এটা কোনো কথা নয়। আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি এবং মানবিকভাবে তাদের আমরা আশ্রয় দিয়েছি। কারণ এখানে শুধু মুসলমান না, বেশ কিছু হিন্দুও নির্যাতিত হয়ে এসেছে। আজকে আমরা যখন দেখি ঐ লাশের ছবি, আজকে সত্যিই বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে।

সমাধান মিয়ানমারকেই করতে হবে

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেছেন “শতশত বছর ধরে মিয়ানমারেই থেকেছে, ওখানে তাদের আদিনিবাস। তাহলে তাদের কেন এভাবে

বিতাড়িত করা হবে? অত্যাচার করা হবে? এভাবে নির্যাতিত করা হবে? সেই সঙ্গে আমি বলব যে, যারা দুইটা পুলিশ মারল, দশটা পুলিশ মারল, কী পাঁচটা মিলিটারি মারল বা একশটা আর্মি লোক মারল এটা মেরে তারা কি অর্জন করেছে? তারা কি এটা বোঝে না যে, তাদের এ সমস্ত কারণে আজকে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যারা নিরীহ, তাদের ঘরবাড়ি পুড়ে যাচ্ছে? তারা মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপরে আঘাত করেছে, ছোট ছোট শিশুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, তাদেরই মা-বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে। তাহলে এ অত্যাচারের সুযোগটা এরা কেন সৃষ্টি করে দিচ্ছে? আর এ থেকে তারা কী অর্জন করেছে? হয়তো যারা এদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে, তারা লাভবান হচ্ছে। কারণ অস্ত্র বিক্রি করতে পারছে। এদের অর্থ যারা জোগান দিচ্ছে, হয়তো তারা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু আজকে তাদের এ সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে আজকে মিয়ানমারের লোকগুলি কষ্ট পাচ্ছে। আজকে তারা গৃহহারা, ঘরবাড়িহারা, মানবেতর জীবনযাপন করেছে। কাজেই আমি এটা বলব যে, এ সমস্ত কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। মিয়ানমার সরকারকেও আমরা এটাও বলছি যে, আমরা এদের আমরা কোনমতেই প্রশয় দেব না। আমাদের যে সিদ্ধান্ত, এটা আমরা সব সময় রক্ষা করি। আমরা কখনও প্রশয় দেব না। কিন্তু মিয়ানমারকেও সেরকম ব্যবহার করতে হবে যে, কয়েকটা লোক, যারা অপরাধী তাদের খুঁজে বের করুন। কিন্তু কিছু ঠকবাজদের কথা বলে এরা সাধারণ মানুষকে হত্যা করবে ছোট ছোট শিশুরা কী অপরাধ করেছে? নারীরা কী অপরাধ করেছে? তাদের উপরে অত্যাচার হবে, এটা আমরা কখনও মানতে পারি না। এটা কিছুতেই মানা যায় না। কাজেই তাদের এটা বুঝতে হবে। তাদেরই নাগরিক, যারা আজকে বাংলাদেশের মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সকলকে তাদের ফেরত নিতে হবে। সেখানে তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা আজকে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের নিরাপত্তা দিতে হবে। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে ‘সেফ জোন’ করে তাদের সেখানে রেখে সমস্ত নিরাপদ ব্যবস্থা তৈরি করে দিতে হবে। আর রাখাইন রাজ্য থেকে যাদের বিতাড়িত করেছে, তাদেরও তাদের ফেরত নিতে হবে। আর কফি আনান যে সুপারিশটা করেছেন তা

বাস্তবায়ন করতে হবে। এই কফি আনান কমিশন মিয়ানমার সরকারই গঠন করেছে। তারা কফি আনানকে আসতেও দিয়েছে, সেখানে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। তাহলে তাঁর সুপারিশটা তারা গ্রহণ করবে না কেন? আর যদি সেখানে তাদের কোনো আপত্তি থাকে, তারা আলোচনা করতে পারে। আলোচনা করে তারা যেভাবে হোক এ সমস্যাটা সমাধান করুক। আমাদের এখানে যারা আশ্রয় নিয়ে আছে দীর্ঘদিন থেকে এবং এখন যারা এসেছে, তাদের প্রত্যেক নাগরিককে তাদের ফিরিয়ে নিতে হবে। কারণ এ সমস্যা মিয়ানমার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যার সমাধানও মিয়ানমারকেই করতে হবে। এটা হল বাস্তবতা।

ষোল কোটি মানুষ খেলে তারাও খাবে

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখানে যদি কোনো রকম সহযোগিতা লাগে হ্যাঁ, প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরা সে সাহায্য করব। আমি এটুকু বলতে চাই যে, অনেকে আজকে যারা আমাদের এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে তাদের আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এটুকু বলব যে, এরা আজকে কষ্ট করে আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছে, এদের এ দুর্ভোগের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন এক দিকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করেন। আর কেউ কেউ এখান থেকে নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য চেষ্টা যেন না করে। আর্থিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা যেন না করে। ষোল কোটি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা হয় তার সঙ্গে আরও এরকম দু-চার/পাঁচ লাখ লোককে খাবার দেওয়ার মতো সে শক্তি বাংলাদেশের আছে এটুকু আমি অন্তত বলতে পারি। আমরা খেলে তারাও খাবে। আমাদের সাধ্যমতো আমরা সে চেষ্টা করে যাব। হ্যাঁ, তারপরে যারা যারা সাহায্য দেবেন ইতোমধ্যে আমাদের কমিটি করা আছে সে কমিটির মাধ্যম এটা দিতে হবে। আমাদের প্রত্যেক এলাকায় আমাদের লোক আছে। আর প্রত্যেকে যারাই ঢুকবে প্রত্যেকের ছবি তোলা, তাদের নাম, ঠিকানা লেখা এবং তার একটা সম্পূর্ণ হিসেব আমরা ইতোমধ্যে করতে শুরু করেছি। এর জন্য কোনো প্রকল্প নয়, আমি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল এবং কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি ইতোমধ্যে। এটা করার জন্য

যা যা খরচ লাগে, ইতোমধ্যে আমরা দেওয়া শুরু করেছি এগুলোর সমস্ত তালিকা করে। কেউ দুই লাখ বলবেন, কেউ পাঁচ লাখ বলবেন, কেউ দশ লাখ বলবেন। যে যার মতো বলতে থাকবেন, সেটা নয়। সত্যিকার যারা এসেছে তাদের সম্পূর্ণ ছবি থাকবে, তাদের আইডেন্টিটি থাকবে যে, তারা কারা। তাদের আপাতত মানে সাময়িকভাবে একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা, সেটাও আমরা করে দেওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছি।

জাতিসংঘে এ বিষয়ে বক্তব্য দেব

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, আপনারা জানেন যে, আমি ১৬ তারিখে জাতিসংঘে যাচ্ছি। সেখানে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্য দেব। নিশ্চয়ই আমি আমার বক্তব্যে মিয়ানমারের বিষয়টা তুলে ধরব। আমাদের যারা ওখানে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা আছেন, যে সমস্ত প্রতিনিধিরা আছেন, তাদের সকলেই এদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাছাড়া প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, আমাদের বর্ডার গার্ড থেকে শুরু করে সকলে এখন সক্রিয় আছেন, সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে আমাদের দলের থেকেও ত্রাণের ব্যবস্থা আমরা করেছি। তারাও কাজ করে যাচ্ছে। মানবতার খাতিরে আমরা এদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এদের সহযোগিতা করে যাচ্ছি। কিন্তু এটা সাময়িক ব্যবস্থা। অবশ্যই মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকত্বের অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। তাদের নিজের ভূমিতে ফেরত নিতে হবে মিয়ানমারকেই, সে কথা বলেই আজকে যে প্রস্তাবটি এসেছে মাননীয় স্পিকার সেটা হল মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ধর্মীয়, জাতিগত, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর অব্যাহত নির্যাতন, নিপীড়ন বন্ধ, তাদের নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করে বাংলাদেশে ‘পুশ-ইন’ করা থেকে বিরত থাকা এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে নিয়ে নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে নিরাপদে বসবাসের ব্যবস্থা গ্রহণে মিয়ানমার সরকারের উপর জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক মহলে জোরালো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানানো হোক। সূত্র: বিডি নিউজ.কম

রোহিঙ্গাদের কষ্ট দেখে কাঁদলেন প্রধানমন্ত্রী

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কক্সবাজার জেলার উখিয়া ও কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে মিয়ানমার থেকে আশ্রয়ের জন্য আসা মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণকালে প্রধানমন্ত্রী প্রায় আধা ঘণ্টা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বারবার রোহিঙ্গাদের জড়িয়ে ধরে আবেগাপ্ত হয়ে পড়েন। এ সময় বোন শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন। শরণার্থীদের সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী রাখাইন সম্প্রদায়ের জনগণের প্রতি অত্যাচার বন্ধ এবং বাংলাদেশ থেকে মিয়ানমারের শরণার্থীদের দেশে ফেরত নিতে মিয়ানমারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ অব্যাহত রাখার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মিয়ানমারের শরণার্থীদের পাশে রয়েছি এবং তাদের সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের দেশে ফিরছে আমরা পাশে রয়েছি।’ তিনি বলেন, ‘তারাও মানুষ এবং মানুষ হিসেবেই তাদের বাঁচার অধিকার রয়েছে। তারা কেন এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে?’ শেখ হাসিনা বলেন, রাখাইন সম্প্রদায়কে তাদের নাগরিক হিসেবে অস্বীকার করার কোনো অধিকার মিয়ানমারের নেই। এক দেশের নাগরিকদের অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ সেই দেশের জন্যই অসম্মানজনক আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে মিয়ানমারের নাগরিকদের তাদের দেশে ফেরত নেওয়ার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, যোল কোটি মানুষের এই দেশে যদি সবার মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা সরকার বিধান করতে পারে, সে ক্ষেত্রে মিয়ানমারের শরণার্থীদেরও কোনো সমস্যা হবে না। আগত রোহিঙ্গাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, এখানে কোনো স্বার্থান্বেষী মহল যদি ফায়দা লোটার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব আশ্রিত জনগণের সঙ্গে কোন অস্থির বা অমানবিক আচরণ করা যাবে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রশ্নে তাঁর সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির পুনরুল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘কোনরকমের সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ আমরা মেনে নেব না। আমাদের মাটি ব্যবহার করে কেউ সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদী কাজ করবে, তা-ও আমরা কখনো বরদাশত করব না।’ প্রধানমন্ত্রী তার ও শেখ রেহানার কথা

উল্লেখ করে বলেন, ‘আমরা দুই বোন পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট মা, বাবা, ভাইবোন সব হারানোর পর রিফিউজি হিসেবে বিদেশে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ১৯৭১ সালে যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আমাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল, তখন আমাদের দেশের মানুষ ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। আজকের যারা নতুন প্রজন্ম, তারা পাকিস্তানি বাহিনীর সেই অত্যাচার-নির্যাতন দেখেনি। কিন্তু আমরা যারা দেখেছি, তারা স্মরণ করতে পারি কী ভয়াবহ ছিল। তাই এই শরণার্থীদের প্রতি আমি সবাইকে সদয় হতে বলব।’ প্রধানমন্ত্রী শরণার্থীদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। এ সময় শরণার্থীরা তাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে মিয়ানমারে তাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা তুলে ধরেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর চোখের পানি দেখে সেখানে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়।

ত্রাণ বিতরণ ও মতবিনিময় অনুষ্ঠানে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মাহমুদ আলী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজ, ভূমি প্রতিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, হুইপ ইকবালুর রহিম, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ, সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, আইজিপি এম শহীদুল হক, কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক আলী হোসেন, শেখ রেহানার পুত্রবধূ সিনিয়র আইএমও কর্মকর্তা পেপী সিদ্দিকসহ স্থানীয় সাংসদ ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : দৈনিক আমাদের সময়

‘প্রয়োজনে খাবার ভাগ করে খাবো, কিন্তু নদীতে ঠেলে দেবো না’

প্রয়োজনে শরণার্থী হিসেবে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ খাবার ভাগ করে খাবে; কিন্তু মিয়ানমারের মতো তাদের নাফ নদীতে ঠেলে দেবে না বলে সংসদকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই সঙ্গে দ্রুত সময়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং জাতীয় সংসদের ১৭তম অধিবেশনে সংসদ নেতার সমাপনী বক্তব্যে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। তিনি বলেন- আমি রোহিঙ্গাদের দুর্দশার চিত্র দেখতে কক্সবাজার সফর করেছি। তাদের দুর্ভোগের কথা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এমন না যে, শুধু দরিদ্র জনগোষ্ঠীই সীমান্ত পাড়ি দিয়ে আমাদের এখানে আশ্রয় নিয়েছে। অনেক ভালো ভালো পরিবার, সরকারি চাকুরীজীবী সবাই চলে এসেছে। তাদের দেখে শুধু আমার একটা কথাই মনে পড়েছে-৭১’এ পাকিস্তানী হানাদাররা আমাদের ওপর যে অত্যাচার-নিপীড়ন চালিয়েছিলো; রাখাইনেও মিয়ানমার সেনাবাহিনী একই কাজ করেছে। আমরাও তো শরণার্থী হয়ে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এদেরকে আমরা কিভাবে ফিরিয়ে দেই, মাননীয় স্পিকার? তবে, এবার দেখলাম যারা এসেছে তাদের মধ্যে নারী-শিশু এবং বয়োবৃদ্ধের সংখ্যাই বেশি। তার মানে কেউই তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এভাবে চলতে পারে না। মিয়ানমার সরকারকে বলবো, যারা দোষী তাদের খুঁজে বের করুন। নিরীহ মানুষের ওপর কোনো ধরনের অত্যাচার মেনে নেওয়া হবে না। এসময় প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা শরণার্থীদের করুণ অবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। বলেন: আমার কাছে একটা বাচ্চা এসেছিলো, তার সামনেই তার বাবা-মাকে হত্যা করা হয়েছে। একটা বাচ্চা মেয়ে বললো, সে তার ভাইয়ের সঙ্গে এসেছে। কিন্তু এখন তাই ভাইকেও খুঁজে পাচ্ছে না। ভাবুন তো, ৭১ সালে আমাদের অবস্থা এমন হয়েছিলো। ১ কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। রোহিঙ্গাদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান গড়ে তোলার কথাও

জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন- আমি তাদের থাকার জন্য ২০০০ একর জমি দিয়েছি। বাঁশের সঙ্গে টিন এবং পলিথিন টাঙিয়ে থাকছে তারা। কিন্তু এভাবে কতো দিন। কিছুদিন পরই স্যানিটেশন সমস্যা তৈরি হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি ভাসান চরে তাদের জন্য অস্থায়ী বাসস্থান তৈরি করতে। এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নেভিকে। ১৬ তারিখে আমি জাতিসংঘে যাচ্ছি। সেখানে রোহিঙ্গাদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগের কথা তুলে ধরবো। রোহিঙ্গাদের নির্যাতনের ব্যাপারে এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে উঠেছে। সুত্র : চ্যানেল আই অনলাইন

বিশ্ব গণমাধ্যমে এক মানবিক রাষ্ট্রনায়ক

বিশ্ব গণমাধ্যমে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে এখন আরো বেশি জায়গা করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বের প্রভাবশালী সব গণমাধ্যমে প্রশংসিত হচ্ছেন। ওইসব গণমাধ্যমে তাকে মানবিক এক রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে। সব জায়গাতেই তার একটি কথাকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে: আমার ১৬ কোটি মানুষকে খাওয়াতে পারলে আরো সাত লাখকেও খাওয়াতে পারবো। কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালংয়ে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের দেখতে গিয়ে শেখ হাসিনা তাদের সাহস এবং আশা ধরে রাখার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আশ্রয় নেয়া মানুষগুলো একদিন নিশ্চয়ই তাদের নিজ দেশে ফিরতে পারবে। মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর অভিযান ও সহিংসতায় রাখাইন রাজ্য থেকে পালিয়ে দলে দলে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য নতুন অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে এরইমধ্যে দুই হাজার একর জমি বরাদ্দও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার কক্সবাজার সফরকে কেন্দ্র করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান এবং বিভিন্ন পদক্ষেপ উঠে এসেছে বিশ্ব গণমাধ্যমে। ভারতের ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস লিখেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সহায়তা করার আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন, এই সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি তাকে বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে। হিন্দুস্থান টাইমস ও একই ধরনের শিরোনাম করে লিখেছে, শেখ

হাসিনা মিয়ানমারের কাছে নিজ দেশের নাগরিকদের ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন। যতক্ষণ সেটা না হচ্ছে ততক্ষণ রোহিঙ্গাদের সাময়িক সহায়তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন তিনি। এদিকে নিউজ১৮ প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের ওপর ফোকাস করে শিরোনাম করে লিখেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর মিয়ানমার বর্বরতা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। রোহিঙ্গারা যেন মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায় সেজন্য সেখানে সেফ জোন বা নিরাপদ এলাকা তৈরি করার পরামর্শও দিয়েছেন শেখ হাসিনা। অন্যদিকে ফার্স্টপোস্ট বলেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের বলেছেন, তার দেশ এমন অবিচার সহ্য করবে না। পাকিস্তানের প্রভাবশালী দৈনিক ডন লিখেছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বর্বর আচরণের কারণে ভর্তসনা করেছেন এবং তাদের ফিরিয়ে নিতে জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন। পাকিস্তান টুডেও একই ধরনের সংবাদ প্রকাশ করেছে। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোতেও গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ হয়েছে শেখ হাসিনার খবর। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি উখিয়ায় অবস্থানকালে শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকারের এক মিনিট ১৫ সেকেন্ড একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মিয়ানমারের উচিত রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়া। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী বা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে রোহিঙ্গা গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালাতে দেয়া মিয়ানমার সরকারের ঠিক হয়নি। সাক্ষাতকারে প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, কেউ অমানবিক হলেও আমরা অমানবিক হতে পারি না। আমরা আশ্রয় নেয়া মানুষগুলোকে আবার বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারি না, কারণ আমরা মানবিক। ব্রিটিশ দৈনিক গার্ডিয়ান মিয়ানমার সরকারের প্রতি রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানের বিষয়টি দিয়ে শিরোনাম করে সংবাদ করেছে। লিখেছে, রাখাইনে সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন শেখ হাসিনা। এমনকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানবতার জননী বা ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ বলে আখ্যায়িত করেছে কয়েকটি

ব্রিটিশ গণমাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট অন্যান্য বেশিরভাগ গণমাধ্যমের মতোই বাংলাদেশের সরকারপ্রধানের রোহিঙ্গাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং তাদের সহায়তা করার আশ্বাসের বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তবে শিরোনাম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হলেও সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনের মূল কথা একই: এক মানবিক রাষ্ট্রনায়কের প্রতিচ্ছবি। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সেনাবাহিনীর বহুদিন ধরে চলমান সংঘর্ষ-সহিংসতা সঙ্কট সমাধানে ২০১৬ সালের আগস্টে গঠিত হয় অ্যাডভাইজরি কমিশন অন রাখাইন স্টেট। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে ওই কমিশন এক বছরের তদন্তের চূড়ান্ত প্রতিবেদন মিয়ানমারের ক্ষমতাসীন দলের প্রধান অং সান সু চির কাছে জমা দেয় চলতি বছরের ২৪ আগস্ট। ৬৩ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদন জমা দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই ২৪ আগস্ট দিবাগত রাতে ত্রিশটি পুলিশ ও সেনাচৌকিতে রহস্যজনক হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় নিহত হয় নিরাপত্তা বাহিনীর ১২ সদস্য। তারপরই হামলার জন্য রোহিঙ্গা ‘জঙ্গি’দের দায়ী করে জবাব হিসেবে সেনাবাহিনী পুরো অঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। সেনাবাহিনীর ওই হামলায় এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫শে মানুষ মারা গেছে, আর প্রাণভয়ে লাখ লাখ রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে পাড়ি জমাচ্ছে বাংলাদেশে। নৌপথে পালিয়ে আসার পথে নৌকাডুবিতেও বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, আনান কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করার উদ্দেশ্যেই মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এই হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

উপসংহার

রোহিঙ্গা শুধু মিয়ানমারের নয়, বাংলাদেশের জন্যও একটি বড় সংকট। বাংলাদেশের মানুষ, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, নিরাপত্তা সব মিলিয়ে একটি হুমকির মুখে রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রোহিঙ্গা ইস্যুতে কাজ করলে মুসলিম বিশ্ব ও পৃথিবীর সকল মানবতাবাদী মানুষের কাছে এক অনন্য মর্যাদায় ভূষিত হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এক অনন্য মানবিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সাময়িক সময়ের জন্য উদ্ভাস্তদের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি স্থায়ীভাবে মিয়ানমারে তাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়ে নিতে বার্মা সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। চলমান এই সংকটের স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত। এ সংকটটি হঠাৎ করেই উঠে এসেছে এমনটি নয়। উপমহাদেশ বিভক্তির সময় ব্রিটিশদের ভুল নীতির খেসারত ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তাছাড়া এর পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কূটচাল। তাই বাংলাদেশকে সতর্ক প্রদক্ষেপে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বর্তমানে এ পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যার সমাধান করা জরুরি। মানবিক ভূমিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাক্ত রাজনৈতিকের পরিচয় দিয়েছেন। একজন দেশপ্রেমিক, মানবতাবাদী ব্যক্তি হিসেবে আমি আশাকরি প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিজীবী, আলেম উলামা ও জনসাধারণকে সাথে নিয়ে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করবেন। আরাকান মুসলমানরা আবার তাহযিব-তামাদ্দুন, শিক্ষা-সংস্কৃতির মশাল নিয়ে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

কবির ভাষায়-

“রোসাঙ্গের রেনেসাঁয় একদা স্নাত হয়ে
ছিল পূর্ব এশিয়ার উজ্জল শিথান,
অথচ এখন তুমি হত্যা ও ধর্ষণ আর লুণ্ঠনে খান খান
আরাকান, বিজ্ঞ আরাকান।